দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও অর্থনীতির ভরাডুবি — পৃঃ ২৩

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না হলে বিচার নিরপেক্ষ হবে না — পৃঃ ১০

৭৫ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ১০ জুলাই, ২০২৩।। ২৪ আষাঢ় - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ভরাডুবি

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ২৪ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০ জুলাই - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,
Website : www.eswastika.com

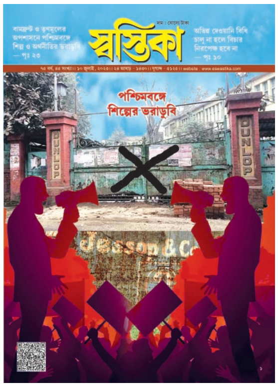

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

তিনশো পঞ্চান্ন ধারাই কি ভবিতব্য? 'ভিক্ষা চাই না, কুকুর সামলাও' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

কোমরের চোট কমাতেও জোট দরকার ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসা থেকে পরিত্রাণ পেতে আদালত পরিত্রাতা কেন? ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না হলে বিচার নিরপেক্ষ হবে না ◻ কানুরঞ্জন দেবনাথ ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকাশে কেন্দ্রীয় নজর ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ১৩

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে বাংলাদেশ ভারতের সাহায্য চাইছে ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ১৬

যোগের প্রসারে ক্রীড়া ভারতীর ভূমিকা ◻ দেবাশিস বিশ্বাস ◻ ১৭

বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের দীর্ঘ অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও অর্থনীতির ভরাডুবি হয়েছে ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ২৩

বাম তৃণমূল মিলে রাজ্যের শিল্প নির্মূল করেছে ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৬

ভারতের জীবন বেদ : সেবা পরম ধর্ম ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

জানা অজানা ব্রহ্মপুত্র ◻ ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস ◻ ৩৪

মোদী সরকারের ন' বছর কৃষি ও কৃষকের প্রতি সরকারের সালতামামি ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৩৫

মোদী সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য চুরি যাওয়া প্রত্নসম্পদ ভারতে ফেরাবে আমেরিকা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৩

গ্রাম উন্নয়নে গো-সম্পদ সুরক্ষা ◻ ড. অনিল কুমার ঘোষ ◻ ৪৪

নালন্দা থেকে মার্সেইলি গ্রন্থাগারে জেহাদিদের অগ্নিসংযোগ ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৭ জুলাই, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৭ জুলাই, ২০২৩

এক দেশ, এক আইন

পৃথিবীর কোনো দেশে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আইন নেই। ব্যতিক্রম ভারত। এখানে মুসলমানদের জন্য মুসলিম পার্সোনাল আইন রয়েছে। ভোটব্যাংক রাজনীতির সুবিধা নেওয়ার জন্য এমন একটি ব্যবস্থা চালু করেছিল কংগ্রেস। সম্প্রতি মোদী সরকার এক দেশ এক আইনের প্রস্তাব পেশ করেছে, যার পোশাকি নাম 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড। অর্থাৎ এই আইন চালু হলে ভারতের সব নাগরিক একটি আইনি ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় আসবেন। এই নিয়ে বিতর্ক যেমন শুরু হয়েছে, ঠিক তেমনই এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন বহু মানুষ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। লিখবেন— বিমলশঙ্কর নন্দ, ড. রাজলক্ষ্মী বসু প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাহাজডুবি

ক্ষমতার তল্পিবাহক না হইলে পশ্চিমবঙ্গে কিছু হইবার নহে। মেধাবী ছাত্রের লেখাপড়া হইবে না। ব্যবসায়ীর ব্যবসা হইবে না, এমনকী যে তরুণ লেখক তাহার প্রথম গল্পটি প্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদকের দরজায় দরজায় মাথা খুঁড়িতেছেন তাহার রচনাও কোনোদিন প্রকাশিত হইবে না। সাফল্যের সিঁড়িতে পা রাখিতে চাহিলে শাসকের ছত্রছায়ায় থাকিতেই হইবে। এই যুগপৎ হীনম্মন্য ও আত্মঘাতী মানসিকতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথম পরিচিত হন বাম আমলে। এই মানসিকতার ফলেই পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের সর্বস্তরে নামিয়া আসিতে থাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়ে। তবে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিল্প ও অর্থনীতি।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এই রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শাসনকালে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, কল্যাণী শিল্পক্ষেত্র, সল্টলেক উপনগরী, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯৬২ সালে তাঁহার দেহরক্ষার বৎসরে জাতীয় শিল্প-মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের অংশীদারিত্ব ছিল ত্রিশ শতাংশ, যাহা এখন তিন শতাংশের তলানিতে নামিয়াছে। আশা করা গিয়াছিল বিধান চন্দ্র রায়ের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীগণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের এই ধারাকে অগ্রগতি প্রদান করিবেন। কিন্তু হইল তাহার বিপরীত। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল হইতেই এই রাজ্যে অরাজকতার শুরু। তাহার পর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসিবার পর অমানিশার যুগ শুরু হইয়া গেল।

মহাকরণের দখল লইয়াই জ্যোতি বসু বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা শিল্পবান্ধব নীতিতে বিশ্বাসী নহেন। শিল্পপতি মাত্রই তাহাদের নিকট বুর্জোয়া, শ্রেণীশত্রু। পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের ঠাঁই হইবে না। শুরু হইল জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের হুমকি, ব্ল্যাকমেলিং এবং ক্ষেত্রবিশেষে দৈহিক লাঞ্ছনার সামনে অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন শিল্পপতিরা। বন্ধ হইতে লাগিল একের পর এক কলকারখানা। ডানলপ, জেসপ, ব্রেথওয়েট, মেটাল বক্স, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি, একদিন যাহারা ছিল পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, তাহাদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিল। যাহারা তাহা পারিল না তাহারা নিঃশব্দে মৃত্যুর দিন গনিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হইয়া পড়িলেন। একসময় যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের শ্রমিকদের রুজিরোজগারের জায়গা, সেই পশ্চিমবঙ্গে বাহিরের শ্রমিকদের আসা তো বন্ধ হইলই, বাঙ্গালি শ্রমিকরাও অর্থরোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হইলেন। বাংলা অভিধানে একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি হইল— পরিযায়ী শ্রমিক।

২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হইল। ক্ষমতায় আসিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার জন্যই টাটাগোষ্ঠী সিঙ্গুরে গাড়ির কারখানা করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফল কী হইতে পারে, সেইদিন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোধগম্য না হইলেও সমগ্র ভারতের শিল্পপতিমহল বুঝিয়াছিল। টাটাগোষ্ঠী ভারতের শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। সুতরাং এই ঘটনার পর ভারতের অন্যান্য শিল্পপতিরা এই রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহী হইবেন না সেই কথা বলাইবাহুল্য। তাহা ব্যতীত তৃণমূলের সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজিও এই রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। দেখা যাইতেছে, জ্যোতি বসু হইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়— কেহই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার কথা ভাবেন নাই। জ্যোতি বসুর নিকট প্রধান ছিল তাহার দল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শুধুই তাঁহার পরিবার। একজন সমাজতন্ত্রের নামে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছেন, অন্যজন চেষ্টা করিয়াছেন ক্ষমতায় থাকিতে থাকিতেই ঘোলাজলে চাঁদামাছ সংগ্রহ করিবার। খেয়াল করেন নাই হিমশৈলের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। জাহাজ ডুবিতে আর বিলম্ব নাই।

সুভাষিতম্

বৃথা বৃষ্টি সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তেষু ভোজনম্।

বৃথা দানং ধনাঢ্যেষু বৃথা দীপো দিবাহপি চ।।

সমুদ্রের ওপর বৃষ্টিপাত বৃথা, ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তিকে ভোজন করানো বৃথা, ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দান করা বৃথা এবং দিবালোকে প্রদীপ প্রজ্বলনও বৃথা।

তিনশো পঞ্চান্ন ধারাই কি ভবিতব্য?

‘ভিক্ষা চাই না, কুকুর সামলাও’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সংবিধান বেত্তা নই, তাই এ রাজ্যে ৩৫৫ ধারা চালু করা নিয়ে তাত্ত্বিক কচকচি আর বিতর্কে ঢুকব না। তবে এমন ধারা যে হবে না সে দাবিটা এখনি সরিয়ে রাখছি না। পঞ্চায়েত ভোটে একটিবার মুখ দেখিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল চোট বা আঘাত পেয়ে পিছোনোর ‘বান্দা’ মমতা নন। রাজনৈতিক ময়দানে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় খানিকটা বাধ্য হয়েই সরে গিয়েছেন মমতা। তাঁর সরে যাওয়া বুঝিয়েছে পঞ্চায়েত ভোটে গ্রাম স্তরে তৃণমূলের ভরাডুবি অনেকটাই নিশ্চিত। তাই অন্তর্ধানের আগে মানুষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে গিয়েছেন পঞ্চায়েত ভোটে সরকার পালটাবে না। তিনি টিকে থাকবেন। বিরোধী বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতার চাতুরি বোঝেন। পালটা বলেছেন মমতার সরকারকে তারা ফেলে দেবেন। শুনেছি তৃণমূলের ভোট পরামর্শ সংস্থাও গ্রাম পঞ্চায়েত লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তারা কেবল পঞ্চায়েত সমিতি আর জেলা পরিষদেই তৃণমূলকে পরামর্শ দিচ্ছে।

তবে মনে হয় এ রাজ্যে এমন কিছু শীঘ্র ঘটতে চলেছে যা মানুষ সাহস করে ভাবতে পারে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন তৃণমূল বা নবজোয়ার বাতিল ধারণা। তাই মমতা তাতে ছেদ টেনেছেন। ইঙ্গিতে কর্মীদের বুঝিয়েছেন পঞ্চায়েত ভোটে কেবল অভিষেকের মুখ রক্ষার জন্য হিংসার প্রয়োজন নেই। তাতে সর্বনাশের আশঙ্কা আর ৩৫৫ ধারার জুজু রাজ্যের মাথায় ঝুলবে। ভোটে অভিষেক হেরে গেলেও তৃণমূল সরকার থাকছে। অনেকে মনে করছেন মমতার এই ভাবনা সিপিএমের শেষ দিকের ভাবনার মতো ভুল। আমার মতে ঠিক উলটো। মমতা সিপিএমকে সরিয়েছিলেন পঞ্চায়েত জয় আর জমি রক্ষার ধুয়ো তুলে। এখন মমতার ঘরের ভিতর শত্রু। দল, প্রশাসন আর পরিবারের দুর্নীতিকে মেনে নেওয়ার জন্য মমতার বিরুদ্ধে বক্র আঙুল উঠেছে। প্রচার থেকে মমতার সরে আসার অন্য কারণ দুর্নীতিকে চাপা দেওয়া। নবজোয়ারে অভিষেকবাবুকে হামেশাই ‘ভাইপো চোর’ শুনতে হয়েছে।

তাই প্রচারে গেলে মমতাকে যে তা আবার শুনতে হবে সেটাই স্বাভাবিক। বিরোধীরা তাই যথার্থ বলেছেন কায়দা করে মমতা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছেন। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তাতে এটা স্পষ্ট যে মমতা তাঁকে এ রাজ্যে হাতে খড়ি দিয়ে কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছেন। রাজ্যপাল রাজ্যের রাজা হয়ে উঠুন কোনো শাসক মুখ্যমন্ত্রী তা চান না। মমতা ব্যতিক্রম নন। তবে মমতার বর্তমান গোদের উপর বিষফোড়া নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। একে রাম তায় লক্ষ্মণ দোসর। ভাইপো অভিষেক তো ছিলেন, তাতে যুক্ত হলেন রাজীব কুমার। ‘বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।’ এক সময় মমতা খোলামঞ্চে দলীয় কর্মীদের উপদেশ দিয়েছিলেন ৭৫ শতাংশ তোলা চাঁদা দলকে দিতে আর ২৫ শতাংশ নিজেদের কাছে রাখতে। তার ফল হয়েছিল উলটো। রাজীব নামে মমতার আস্থা সর্বদাই বেশি। পলাতক পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার, দলবদলু রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আর রাজীব সিনহা। এছাড়া তাঁর এক সময়ের রাজনৈতিক প্রভু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তো রয়েছেনই।

> **মমতা ৩৫৫ ধারার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। ওই ধারা লাগু হলে মমতার যারপরনাই খুশি হওয়ার কথা। কারণ তাঁর এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা। মমতার ফ্র্যাঙ্কেনসটাইনরা তাঁকেই গিলতে বসেছে।**

মমতার ভাষায় তথাকথিত আর প্রায় গুরুত্বহীন এই পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা সঙ্কটময় আর ঘোরালো সে তর্ক অর্থহীন। তা বোঝার জন্য রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সক্রিয়তা অনুসরণ করাই যথেষ্ট। তিনি রাজভবনে ‘পিস রুম’ বা ‘শান্তি কক্ষ’ খুলেছেন। তা আদতে শাসকের শাসানি বন্ধ করার ‘ওয়ার রুম’ বা ‘যুদ্ধ কক্ষ’। এই শান্তি কক্ষ যে আগামীতে মমতার অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে তা পরিষ্কার। মমতা ৩৫৫ ধারার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। ওই ধারা লাগু হলে মমতার যারপরনাই খুশি হওয়ার কথা। কারণ তাঁর এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা। ভিক্ষা চাই না মা, কুকুর সামলাও। মমতার ফ্র্যাঙ্কেনসটাইনরা তাঁকেই গিলতে বসেছে। মমতা সেই কাপালিক যিনি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটি মিথ্যা পৃথিবী সৃষ্টি করে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। এক সময়ের মাটির নেতা মমতা আজ তাই ঘরবন্দি। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সেখান থেকেই ভাষণ দিচ্ছেন। তা বোঝার জন্য রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সক্রিয়তা অনুসরণে করাই যথেষ্ট। তাই নিজের ঘরে পিসরুম বা শান্তিকক্ষ খুলে তিনি তা জানান দিয়েছেন। আদতে তা শাসকের শাসানি বন্ধ করার ‘ওয়ার রুম’ বা ‘যুদ্ধকক্ষ’। মমতা তা ভালো বোঝেন। □

কোমরের চোট কমাতেও জোট দরকার

চোটকাতরেষু দিদি,

আপনি ভালো আছেন শুনলাম। ক'দিন খুব টেনশনে গিয়েছিল। কোনও খবরই পাচ্ছি না। শেষ দেখলাম আপনি বাড়ি থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তবে রাতের ঘুমটা ভালো হলে। আসলে দিদি আমিও খুব টেনশনে। আপনার মতোই। ভাইপোর মতোও। বুঝতে পারছি কত টেনশনে থাকলে আপনি পঞ্চায়েতের মতো তুচ্ছ নির্বাচনেও প্রচারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন।

ওদিকে দিদি আগামী লোকসভা ভোটের জন্য বিজেপি কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছে। জোট কিন্তু চাই দিদি। নরেন্দ্র মোদীকে আর প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া যাবে না। গোটা বিশ্বে লোকটা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তিনি একাই একশো। কিন্তু দিদি জোট হবে কি?

আসলে জোটটা তো কতগুলো পরিবারের। গান্ধী, উত্তরপ্রদেশের যাদব, বিহারের যাদব, মহারাষ্ট্রের ঠাকরে, পশ্চিমবঙ্গের বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মোট দশটি পরিবারের জোট। এর সঙ্গে কিছু আপাতত পরিবারহীন দলও রয়েছে। তবে তাঁরা সংখ্যালঘু। মাত্র পাঁচ। কিন্তু জোটে ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-আপ সম্পর্ক 'কাঁটা' হয়ে ফুটছে। এবার জোটের পথে কি বাংলাও 'কাঁটা' হবে? পাটনায় বিরোধী জোটের প্রথম বৈঠকের পর ১৫টি দল মিলে ঠিক করেছে, বিজেপিকে রুখতে হবে। পরের বৈঠকে জোট নিয়ে রাজ্যওয়াড়ি আলোচনা হতে পারে। কিন্তু দেশের অন্যত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে জোট বা আসন সমঝোতা হলেও বাংলায় কি তৃণমূলের সঙ্গে এক টেবিলে বসা সম্ভব সিপিএম বা কংগ্রেসের পক্ষে? বিশেষত, যে ভাবে প্রতিনিয়ত কংগ্রেস এবং সিপিএম আপনার দল তৃণমূলকে আক্রমণ করে? আপনি সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে ছবি তুলতে পারলেও, রাহুলকে কাছে টেনে নিতে পারলেও মহম্মদ সেলিম বা অধীর চৌধুরীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা পান করতেও পারবেন কি?

বাংলার মতো সমস্যা রয়েছে দিল্লি এবং পঞ্জাবেও। দু'টি রাজ্যেই ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি (আপ) কি আদৌ সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে এক মঞ্চে উঠবে? আগামীদিনে আরও রাজ্যে শক্তি বাড়ানোর কথা বলছেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি লোকসভা ভোটে বাংলায় প্রার্থী না-দিতে চাইলে অবাকই হতে হবে। তাদের কি কোনও 'ইতিবাচক' আসন ছাড়তে চাইবেন দিদি? আপনি বারবার বলেছেন, দিল্লিতে 'মহাজোট' করেই ছাড়বেন। কিন্তু পাশাপাশিই বলেছেন, বাংলায় 'মহাঘোঁট' ভেঙে দেবেন! সমস্যা হলো, দিল্লির মহাজোট এবং বাংলার মহাঘোঁটের কুশীলব তো একই— সিপিএম ও কংগ্রেস।

আমার তো মনে হচ্ছে, জোট আসলে 'সোনার পাথরবাটি'। প্রতিবারই লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গঠনের চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই বিরোধী জোট সে ভাবে সফল হয় না। ২০১৪ সালেও হয়নি। হয়নি ২০১৯ সালেও। কিন্তু হয়েছেটা কী?

জোট কিছুটা হলেও হতে পারে বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে। অতীতেও যেমন হয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের জোট না হলেও উত্তরপ্রদেশে প্রয়াত মুলায়ম সিংহ যাদব সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেননি। আবার মুলায়ম ছাড়াও তাঁর পরিবারের আরও চারজনের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেস। ঘটনাচক্রে সপা ওই পাঁচটি এবং কংগ্রেস সেই দু'টি আসনেই শুধু জয় পেয়েছিল সে বার। মানে পারিবারিক জোটের সুফল মিলেছিল।

প্রশ্ন অন্যত্রও। বামবিরোধী রাজনীতি করেই তো আপনার উত্থান, সেই দিদি কি সিপিএমের সঙ্গে জোট গড়তে চাইবেন? তবে দিদি, জোট কিন্তু গড়তেই হবে। না হলে সমূহ বিপদ।

পাটনায় বৈঠকের আগেই অধীর চৌধুরী তাকে বর্ণনা করেছিলেন 'লক্ষ্মীপুজোর নেমন্তন্ন' বলে। পরে বলেছেন, 'বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন' রক্ষা। আসলে দিদি, ওই কথাটাই ঠিক। পাটনায় কোনও জোটের বৈঠক হয়নি। ওখানে দশটি পরিবারের সঙ্গে পাঁচটি ছোটো দল গিয়েছিল। মোদীজী পরিবারতন্ত্র শেষ করার যে লড়াই শুরু করেছেন তা থেকে বাঁচতেই গান্ধী, যাদব, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সম্মিলন। এটা আমি বলিনি কিন্তু। বিজেপির লোকেরা বলছে শুনলাম।

কিন্তু জোট জোট এই খেলা কেন? আমার কাছে একটা উত্তর রয়েছে। সবাই একই কারণে গিয়েছে। বৈঠকে গিয়ে সবাই বোঝাতে চেয়েছে আমার কিন্তু জোট গড়ার ভাবনা ছিল। আমি কিন্তু বিজেপি বিরোধী, মোদী বিরোধী। জোটটোট নয়, আসল দায় 'আন্তরিকতা'র প্রমাণ দেওয়া। জোট ভাঙার দায় আর কে নিতে চায়! □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসা থেকে পরিত্রাণ পেতে আদালত পরিত্রাতা কেন?

আদালত জানে তারা নীতির রক্ষক না হলে, গণতন্ত্রের প্রহরী না হলে দেশের সংবিধানের পঞ্চায়েত রাজ একটি তামাশায় পরিণত হবে।

গণতন্ত্রকে পশ্চিমবঙ্গে টিকিয়ে রাখতে এখানকার আসন্ন পঞ্চায়েতে মানুষের জীবনহানি, অঙ্গহানি, ইজ্জতহানি, গৃহহানি আটকাতে আজ প্রতিনিয়ত আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি এক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই ঈর্ষণীয়। রাজনৈতিক মতের ভিন্নতা ধ্বংস করতে খুন, হিংস্র ভীতিপ্রদর্শন এবং প্রশাসনিকভাবে বদলি ইত্যাদি সবরকমের প্রতিশোধ নেওয়ার পদ্ধতি আজ এ রাজ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য একটু পিছিয়ে গিয়ে উৎস সন্ধান করলে মধ্য ৬০-এর দশক উঠে আসবে। সেই সময় বামপন্থীরা কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে আবির্ভূত হন। তৎকালীন নির্বাচনের সময় এলাকা দখল ও দলীয় আধিপত্য জারি রাখার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হতো সামরিক অভিধান অনুযায়ী তার নাম এরিয়া ডোমিনেশান। এই পদ্ধতিতে বিপক্ষ দল তাদের ভোটের প্রচার ও নাগরিকদের ভোট দেওয়াকে সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে সম্পূর্ণ অধিকারহীন করে তুলেছিল। কিন্তু একই সময়ে দেশের বাকি অংশে নির্বিঘ্নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভয়হীন ভোটদান, সাধ্যমতো নির্ভুল ভোটার তালিকা, বোনাস ভোট দেওয়া বা ত্রুটিহীন ভোট গণনার পর ফল ঘোষণার প্রক্রিয়া দ্রুত সফল করতে মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের কাজকর্মের গতিমুখ ছিল গণতন্ত্রকে ম্রিয়মাণ করে দিতে সদা ক্রিয়াশীল।

এখানে বলা জরুরি আজ নির্বাচনী হিংসাকে সক্রিয় করা কেবলমাত্র বিধানসভা বা লোকসভার মতো নির্বাচনে যেখানে গুরুত্ব অনেক বেশি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিমবঙ্গবাসী আতঙ্কগ্রস্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত হিংসার প্রকাশ বহুগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা এটিই পঞ্চায়েতের কালপর্ব। এই সূত্রে সংবিধানের ১৯৯২-এর ৭৩তম সংশোধনী অনুযায়ী এবং সর্বোচ্চ আদালতের অনুমোদন প্রাপ্ত নিয়মে গ্রামে ও জেলার অহিংস নির্বাচন পরিচালনা করতে ৮২২ কোম্পানি প্যারা মিলেটারি বাহিনী দরকার।

প্রথম দিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিল স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে আশপাশের কিছু রাজ্য থেকে পুলিশ বাহিনী এনে নির্বাচন করলে তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। আর ভোট যখন সবগুলি জেলাতেই ১ দিনে সমাপ্ত করা হবে তখন তাদেরও বেশিদিন আটকে রাখতে হবে না। কিন্তু আদালত এই প্রস্তাবকে আদৌ মানতে পারেনি। তাদের এই ব্যবস্থা ভোট করার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়নি। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আদালত শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী আনাকে বাধ্যতামূলকই করেনি, কত কোম্পানি প্রয়োজন সে সংখ্যাও তারা জানিয়ে দিয়েছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রাথমিকভাবে ২২ কোম্পানি বাহিনীই যথেষ্ট মনে করেছিল। এর বিপরীতে হাইকোর্ট শুধু ৮০০ কোম্পানি বাড়িয়ে ৮২২ নিদান দিয়েছিল। বিষয়টি সঠিক স্বচ্ছ হয়ে গেল।

হ্যাঁ, আদালত এখানেই থেমে থাকেনি। তারা যে কোনো ধরনের অস্থায়ী কর্মী, প্যারাকর্মী বা কোনো ধরনের সিভিক কর্মীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার আদেশ দেয়। এছাড়াও আদালত বহু মনোনয়নপত্র জমার ক্ষেত্রে যেগুলি ভীতিপ্রদর্শন, শারীরিক নিগ্রহ বা সক্রিয় বাধাদানের কারণে প্রার্থীরা জমা দিতে পারেননি সেই কাগজপত্র সমেত প্রার্থী পদের নমিনেশন স্থানীয় রিটার্নিং অফিসারকে জমা নেওয়ার নির্দেশও দেন। এ ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গে গ্রাম সমিতি আসনের বিশেষত বীরভূম, বাঁকুড়ায় ১০ শতাংশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর প্রায় অধিকাংশই শাসক তৃণমূলই অধিকার করেছে। সামগ্রিকভাবে আদালত পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই একটি বড়ো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হাত দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এখন দেখা যাচ্ছে আদালতের নির্বাচন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করতে। ভারতের 'পঞ্চায়েত রাজ' প্রথাকে সংবিধান যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে রাজ্যগুলির নির্বাচন কমিশনের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা অর্পণ করার ব্যবস্থা করে গেছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কাজের ক্ষেত্রে

functional autonomy থাকবে। বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত সর্বক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। তাহলে সমস্ত ক্ষমতাই যখন নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া আছে তখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টকে দোষী সাব্যস্ত করাই উচিত যে তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর নিজস্ব অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করছে যা অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে আদালত নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে পরিণত হবে।

অবশ্যই এই সূত্রে কোনো সন্দেহ নেই যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইনগত এই ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনা কড়া আইনি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কিন্তু হায়! পশ্চিমবঙ্গের শাসকছাড়া সমস্ত বিরোধী দল বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, আই এস এফ আদালতের এই মাথা ঘামানো এবং বিভিন্ন মামলা অনুযায়ী যাবতীয় রায় প্রদানকে স্বাগত জানাচ্ছে। তারা বলছে এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার ও পবিত্রতা রক্ষিত হচ্ছে। এই সম্মিলিত ঐকমত্য পোষণের কারণ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অধিকর্তার (অবসরপ্রাপ্ত আইএএস) নির্দিষ্ট দলের স্বার্থ রক্ষা করে তাঁর নির্বাচনী কার্যকলাপ পরিচালনা করা। এর ফলে দেশে গণতন্ত্রের নামে মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের মূলগত কাঠামোকেই টলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে বিপক্ষের মামলা করার পরও কি আদালত মুখ ফিরিয়ে থাকবে? নাকি গণতন্ত্রের কাঠামোকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে তারা আইনের ক্ষমতা অনুযায়ী মতামত দেবে?

আদালত জানে তারা নীতির রক্ষক না হলে, গণতন্ত্রের প্রহরী না হলে দেশের সংবিধানের পঞ্চায়েত রাজ একটি তামাশায় পরিণত হবে। এর পরও একটি বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়। বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপ্ত পরিণতি অনুযায়ী মনে হয় পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার মুখ দেখা যাবেই। এ পর্যন্ত ১২টি জীবন চলে গেছে। আগের নির্বাচনের অর্থাৎ পঞ্চায়েত ও বিধানসভার নির্বাচন পরবর্তী প্রক্রিয়ার ইতিহাস অনুযায়ী হিংসা ফল প্রকাশের পরও তার বিকৃত চেহারা দেখাবে। মানুষের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ ভয় প্রবলভাবে বিরাজ করছে যে পুলিশ প্রশাসনের অনুকূলেই কাজ করবে। যেহেতু মমতা ব্যানার্জি সরকারের ইভিএম-এর ওপর কোনো বিশ্বাস নেই সেই কারণে ব্যালট পেপারে হওয়া ভোটে ব্যাপক কারচুপি হবে। একই সঙ্গে শাসক দলের সামগ্রিক প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের ওপর দ্বিধাহীন নির্দেশ থাকবে যাতে শাসক তৃণমূল দলের ব্যাপক নির্বাচনী জয় হয়। এটি নিশ্চিত করতে যে কোনো পন্থা নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন নিতে পারে। এখানে তাদের খোলা ছাড়।

এক কথায় বলতে গেলে যুগ যুগ ধরে অনুসৃত কোনো গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে এক ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্ঘাত করা আজ আর আদৌ কোনো বিচার্য বিষয় নয়। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব নেওয়ার ১ দিনের মধ্যেই এক দফায় নির্বাচন অবলীলায় ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর কর্মজীবনের যাবতীয় বিশ্বাস তিনি রাজ্য পুলিশের ওপর ন্যস্ত করলেন যখন তিনি জানতেন (তিনি এই রাজ্যে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন) যে তাদের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও একই সঙ্গে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন গ্রহণ করার কোনো সদিচ্ছাও আদৌ নেই। কিন্তু আদালত সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝেছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন বাস্তবে গণতন্ত্র হত্যারই শামিল।

শোকসংবাদ

গৌতম সরকার ॥ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে হিন্দু সংগঠনের কাজের নীরব সূত্রধর সদ্য প্রয়াত সুকুমার রায় চৌধুরী পাড়ার লোকের কাছে মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার অবসানের পর বুনিয়াদপুরে এসে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি পরিবারের ছেলে-

মেয়েদের নিয়ে শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে প্রথম দিকে বুনিয়াদপুরে প্রভাত শাখা শুরু তাঁর আশ্রমেই হয়, সেটাই প্রথম সঙ্ঘ স্থান। পরে সঙ্ঘস্থান বুনিয়াদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে স্থানান্তরিত হয়। বুনিয়াদপুরে শাখা শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ঐতিহাসিক 'একাত্মতা যজ্ঞ যাত্রা' শুরু হয়। বুনিয়াদপুরে নতুন বড়ো টিম এবং রথের যাত্রাপথ বদল হয়ে ইটাহার হয়ে যাবার বদলে কালিয়াগঞ্জ, বুনিয়াদপুর হয়ে যাবে ঠিক হয়। প্রমুখ হিসেবে সুকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে তাঁর আশ্রম চালানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম, লেগে থাকার ক্ষমতা শেখার মতো। যতদিন শরীর ঠিক ছিল কোনো বাধা মানেননি। আশ্রমকে কোনো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ কানে তোলেননি। তবুও তৎকালীন বিভাগ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারদার প্রচেষ্টায় বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের 'বিবেকানন্দ সেবা পুরস্কার'-সহ অনেক আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে আশ্রমের কিছু জমি হিন্দু মিলন মন্দিরকে দান করেন। আজ সেখানে মন্দির স্থাপিত হয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীর যখন অসহযোগিতা শুরু করে তখন তার ঘাম রক্ত ঝরানো আশ্রমকে 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের' সঙ্গে যুক্ত করেন। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হন, হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বছরখানেক আগে সর্বভারতীয় পুরস্কার পান কিন্তু নিজে যেতে না পারার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের-সহ জেলা সম্পাদক সুকমল সরকার পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। অনেক লেনা দেনা শেষ করে গত ২৯ জুন তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের সমাপ্তি হলো। তাঁর কর্মময় জীবনের প্রেরণা সকলের মধ্যে স্ফুরিত হোক, এই কামনা করি।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না হলে বিচার নিরপেক্ষ হবে না

কানুরঞ্জন দেবনাথ

একটি দেশ, দেশটির নাম ভারত। দুইজন পুরুষ। একজনের নাম কমল। আর একজনের নাম আনোয়ার। দুইজনেই দেশটির নাগরিক মানে ভারতের নাগরিক। দু'জনেই বিবাহিত। কমলের স্ত্রীর নাম নমিতা। আর আনোয়ারের স্ত্রীর নাম ফারজানা। দু'জনেই বর্তমানে ঘরে একজন স্ত্রী থাকতে আরেকটি বিয়ে করেছে। এই দুইজনের স্ত্রী ভারতের আদালতে স্বামীর বিচারের জন্য আবেদন করলেন। আদালত সব শুনলেন এবং দেখলেন ও বুঝলেন যে দুটি মামলার ঘটনা ঠিক একই রকম। মামলা দুটির মধ্যে একটুকুও পার্থক্য নেই। আদালত রায় ঘোষণা করলেন। রায়ে কমলের সাত বছরের জরিমানা-সহ জেল হলো, কিন্তু আনোয়ার বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। তার কিছুই হলো না। এরপরের ঘটনা। কমল তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইল। আদালত এবার কমলকে তার প্রথম স্ত্রীর ভরণ-পোষণের এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বললো। আনোয়ারও তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিল। তালাকের বিনিময়ে আনোয়ারের প্রথম স্ত্রী কিছুই পেল না।

হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলালের ছেলে চন্দ্রমোহন দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু ধর্মে হিন্দু হওয়াতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারছিল না। আদালতের রায়ে শাস্তির ভয় ছিল। চন্দ্রমোহন একটা সহজ উপায় খুঁজে পেলেন। এবার চন্দ্রমোহন মুসলমান হয়ে গেলেন। নাম পালটে রাখলেন চাঁদ মহম্মদ। মুসলমান হয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বিয়েও করে ফেললেন।

প্রখ্যাত নামি দামি বাকপটু বাঙ্গালি গায়ক এবং ভয়েস অব আমেরিকার প্রাক্তন খবর পাঠক সুমন চট্টোপাধ্যায় একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান। ভয়েস অব আমেরিকায় খবর পাঠকে চাকরির সময় এবং আমেরিকা থাকাকালীন তার সহকর্মী সোফিয়া নাজমা নামে একজন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়ে যান। ওই মহিলাকে তিনি বিয়ে করতে চান। বাধা হিন্দু ধর্ম। তাই হিন্দু ধর্মটাকেই ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। নাম বদলে হয়ে যান মহম্মদ ফারুক। এবার বিয়ে করতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হলো না। বুক ফুলিয়ে বিয়ে করে ফেললেন। এরপর ওই মুসলমান মহিলাকে কয়েক বছর পরে তালাক দিয়ে মারিয়া নামে এক জার্মান খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করে ফেললেন। এবার মুসলমান থেকে আবার হিন্দু নাম নিলেন। আবার কয়েক বছর পরে বাংলাদেশের প্রখ্যাত গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিনের প্রেমে পড়লেন আমাদের চিরপ্রেমিক। বিয়ে করতে গেলেন। আবার বাধা এই হিন্দু ধর্ম। কারণ সুমনবাবু তার দ্বিতীয় স্ত্রী মারিয়াকে তালাক দিতে পারছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে এবার এই হিন্দু ধর্মকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে আবার তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। সুমন চট্টোপাধ্যায় হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে গেলেন মুসলমান কবীর সুমন।

> “হিন্দু পুরুষরা যদি একটি বিয়ের আইনকে মানতে পারে, তাহলে বিশেষ সম্প্রদায় একটি বিশেষ আইনকে মানতে পারবে না কেন? হিন্দুরাও তো বলতে পারতো তাদের সমাজে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল।”

প্রথম ঘটনায় দু'জনের দু'রকম বিচারের একটাই কারণ তা হলো দেশ এক হলেও এবং আদালত একই দেশের হলেও দু'জন ধর্মের দিক দিয়ে আলাদা। একজন হিন্দু, আরেকজন মুসলমান। তাই তাদের বিচারের রায়ও হলো আলাদা। একজন ধর্মে হিন্দু তাই শাস্তি পেল। বোঝা যাচ্ছে এখানে হিন্দু হওয়াটাই অন্যায়, দ্বিতীয় বিয়েটা অন্যায় নয়। কারণ অন্যজন মুসলমান, তাই শাস্তি কিছুই পেলো না। মুসলমান হওয়াতে লোকটা অন্যায় করলেও অন্যায় থেকে মুক্ত। আর কবীর সুমন ও চন্দ্রমোহনরা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিজেদের চোদ্দ পুরুষের ধর্মটাকেই বিসর্জন দিয়ে দিলেন— মানে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। (পরে অবশ্য চন্দ্রমোহন চাঁদ মহম্মদ থেকে আবার নাকি চন্দ্রমোহন হয়েছেন, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালি চিরপ্রেমিক, চিরযুবক সুমন চট্টোপাধ্যায়, যার মুসলমান নাম কবীর সুমন যিনি নাকি আরও বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি মুসলমান হয়েই আছেন) কারণ হিন্দু ধর্মে থাকলে দেখতে পাচ্ছে যে তাদের শাস্তি অনিবার্য। আর মুসলমান হয়ে গেলে বেকসুর খালাস

দিতে আদালত বাধ্য। এরকম বহু হিন্দু শুধু আইনের শাস্তি থেকে বাঁচতে দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন।

এই যে এক দেশ, একই কাণ্ড বা ঘটনা দুইজনে করছে অথচ একজন শাস্তি পাচ্ছে, আরেকজন ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। একজন মহিলার মানে নমিতার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার তালাক প্রাপ্ত স্বামী কমল নিচ্ছে, আবার আরেকজন মহিলার মানে ফারজানার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার তালাকপ্রাপ্ত স্বামী আনোয়ার নিচ্ছে না, অথচ আদালত ফারজানার স্বামী আনোয়ারকে কিছুই করতে পারছেন না। এর জন্য আমাদের দেশের কানুন ব্যবস্থাই দায়ী। এর মূল কারণ হলো ধর্ম ভেদে ভারতের আইনের ভিন্নতা। আজকে যদি সারা ভারতের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এক আইন চালু থাকতো, তাহলে কমল, আনোয়ার, কবীর সুমন, চন্দ্রমোহনরা সমদোষে সমান বিচার আলাদত থেকে পেয়ে যেতেন। কবীর সুমন আর চন্দ্রমোহনরাও হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে যেতেন না। হিন্দু ধর্মকে নিয়েও ছেলেখেলা করতেন না। আর ফারজানাও নমিতার মতো তার তালাক প্রাপ্ত স্বামী থেকে ভরণপোষণ ঠিকমতো বা যথারীতি পেয়ে যেতেন।

ইউসিসি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড-এর বাংলা অর্থ হলো অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা অভিন্ন দেওয়ানি আইন। সব ধর্মের মানুষের জন্য 'এক দেশ এক আইন'। ভারতের সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদের ভাগ ৪-এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে— 'সরকার সারা দেশের মানুষের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইন লাগু করার প্রচেষ্টা করবে।' ভারতীয় সংবিধানেই ভারতকে বা ভারত সরকারকে বা কেন্দ্র সরকারকে ভারতের সব ধর্মের বা জাতির বা সম্প্রদায়ের মানুষকে একটি অভিন্ন আইনের আওতায় আনার কথা বলেছে বা নির্দেশ দিয়েছে যা নাকি আজ একেক ধর্মের মানুষ একেকভাবে নিজেদের ধর্মীয় নিয়মের দ্বারা চলছে।

'হিন্দু পার্সোনাল ল' কী? ভারতে হিন্দুদের জন্য 'হিন্দু কোড বিল' তৈরি হয়েছে। দেশের মধ্যে হিন্দুদের এই বিলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর নির্দেশে এই বিলটি পাশ করা হয়। এই আইন মহিলাদের অধিক ক্ষমতাবান বানিয়েছিল। এই নিয়ম অনুযায়ী মহিলারা পৈতৃক সম্পত্তির এবং ধর্মীয় সম্পত্তি মালিক হতে পারেন। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক একজন আর একজনকে বিয়ে করার অধিকার হয়েছে। কিন্তু একজন হিন্দু ব্যক্তি একটির বেশি বিয়ে করতে পারবেন না।

'মুসলিম পার্সোনাল ল' কী? এই আইনটি শুধু ভারতের মুসলমানদের জন্যই। এই আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিত মুসলিম পুরুষ তার নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে মাত্র তিনবার 'তালাক' বলেই ত্যাগ দিয়ে দিতে পারে। যদিও 'মুসলিম পার্সোনাল ল' নিয়মে অনেক প্রকারের তালাকের কথাই বলা আছে, কিন্তু এর মধ্যে তিন তালাকও একপ্রকার তালাক মানা হয়।

তালাকের পরে যদি আবার দুইজন একসঙ্গে বিয়ে করে থাকতে চায় তো তবে ওই তালাক প্রাপ্ত মহিলাকে অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে হবে এবং ওই অন্য পুরুষটির সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ বা সহবাস করতে হবে। এই ব্যবস্থাকে 'নিকাহ্ হালালা' বলা হয়ে থাকে। এবার শারীরিক সম্বন্ধ বা সহবাসের পর এই অন্য পুরুষটির সঙ্গে তালাক নেওয়ার পরেই প্রথম পুরুষকে বা আগের স্বামীকে আবার বিয়ে করতে পারবে। এই আইনে মহিলাকে তালাক দেবার পর কোনো প্রকার সম্পত্তি বা ভাতা ভরণপোষণের অধিকার মহিলার থাকবে না। তিন তালাকের পর মুসলমান পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি বিয়ে করতে পারে, কিন্তু একজন মুসলমান মহিলাকে ইদ্দতের নিশ্চিত দিন যাপন করতে হয়। তাছাড়া একজন মুসলমান পুরুষ চারটে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে।

শাহবানো মামলা : ১৯৮৫ সালে মধ্যপ্রদেশের শাহবানো নামের পাঁচ সন্তানের এক মুসলমান মহিলার স্বামী একটি অল্পবয়সি মেয়েকে বিয়ে করে বৃদ্ধ বয়সে শাহবানোকে তালাক দিয়ে ইদ্দতের পর মানে তালাকের তিন মাস পরে তার সন্তান-সহ নিজের ভরণপোষণ তার পূর্বের স্বামী বন্ধ করে দিলে সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ অনেক বিচার বিবেচনা করে, ইসলামি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে রায় দেন যে শাহবানোর পূর্বতন স্বামী যেন শাহবানোকে এবং তার পাঁচ সন্তানকে ভরণপোষণের খরচ দেন। সেই সঙ্গে সুপ্রিমকোর্ট দেশে একটি ইউসিসি আইন বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করার জন্য চেষ্টা চালাতে কেন্দ্রের প্রতি বা ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ বা আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

এই রায় ঘোষণা হলে সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে মুসলমানরা একে ইসলাম বিরোধী বলে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। তৎকালীন কেন্দ্রের রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে বা মুসলমান ভোট না পাবার ভয়ে এর পরের বছর ১৯৮৬ সালে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিল পাশ করে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক যুগান্তকারী রায়টি বাতিল করে দেয়। এর ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে শাহবানোর মতো তালাক প্রাপ্ত অসহায় নিরুপায় মহিলা তালাকপ্রাপ্ত স্বামীর কাছ থেকে নিজের এবং সন্তানের বেঁচে থাকার জন্য বা জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সব ভাতা বা টাকা পয়সা পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন তা তৎকালীন রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের কারণে বাতিল হয়ে গেল। শাহবানোর মুখের হাসি কান্নায় মিলিয়ে গেল।

সরলা মুদগল বনাম ভারত সরকার মামলা ১৯৯৫ : এই মামলাটি চারটি মামলার সমষ্টি। সবকটি মামলার মূলেই ছিল হিন্দু পুরুষরা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ বা লাভালাভের জন্য হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে যেত। যেমন একজন হিন্দু পুরুষ ঘরে একজন স্ত্রী থাকার পরেও দ্বিতীয় বিয়ে করতো এবং হিন্দু আইনের শাস্তি থেকে

ফঃ ২

বাঁচার জন্য মুসলমান হয়ে যেতো। অর্থাৎ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাতো এবং পাশাপাশি হিন্দু ধর্মকে নিয়ে ছেলেখেলা করতো। সবগুলি মামলাতেই এই পুরুষেরা ধর্ম পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে বা ধর্মের অপব্যবহার করে বিবাহ করেছেন। এইসব কিছুর মূলে রয়েছে দেশে একটি মাত্র আইন সব ধর্মের জন্য না থাকা। আজ যদি সব ধর্মের মানুষের জন্য একই আইন থাকতো তাহলে কি নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করতে পারতো?

তাই সুপ্রিম কোর্ট তখন বলেছেন যে, 'সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪'-এর ধারাটি মোটেই কোনো সভ্য সমাজের ধর্মের সঙ্গে 'পার্সোনাল ল'য়ের কোনো সম্পর্কিত নয়। ইউসিসি দেশে চালু হলে মৌলিক অধিকারের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। ইউসিসি দেশে চালু হলে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে কথাটি একদম ঠিক নয়। বিবাহ, উত্তরাধিকার এবং এরকম সামাজিক কিছু বিষয় ধর্ম থেকে আলাদা। ইউসিসি সংসদে আইন প্রণয়ন করে চালু করা যায়। 'বহুবিবাহ' প্রথাটা একটা সমাজবিরুদ্ধ প্রথা। যেরকম হিন্দু সমাজের 'সতীদাহ' প্রথা বা 'নরবলি' প্রথাকে মানব হিতে আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং হিন্দু সমাজও তা মেনে নিয়েছে। ঠিক তেমনি 'বহু বিবাহ' প্রথার মতো এমন কিছু সমাজ বিরুদ্ধ প্রথাকে ওই সমাজের কল্যাণের স্বার্থে বা মানব কল্যাণের স্বার্থে আইন করে দেশে নিষিদ্ধ করা যেতেই পারে। আদালত এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামি দেশ যেমন— সিরিয়া, টিউনেশিয়া, মরক্কো, ইরান প্রভৃতি দেশ নিজেদের 'পার্সোনাল ল'তে সংশোধন এনে 'পার্সোনাল ল' এর অপপ্রয়োগ বন্ধ করেছে।

কেন দেশে ইউসিসি দরকার? আলাদা আলাদা ধর্মের আলাদা আলাদা আইন বিচার ব্যবস্থার উপরে বিরাট বোঝা হিসেবে দেখা দেয়। ইউসিসি চালু হলে এই অসুবিধাগুলি থেকে মুক্তি মিলবে আর আদালতে ঝুলে থাকা বহু বছর যাবৎ মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটবে। বিয়ে, তালাক, দত্তক নেওয়া এবং সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে সবার জন্য একরকম আইন বা কানুন হবে, তখন কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধর্মেরই হোক না কেন— সমান অপরাধে সমান বিচার সবার জন্যই থাকবে। অপরাধ একরকম অথচ বিচার ভিন্নরকম হবে না। সবার জন্য আইনে সমানতা এলে দেশ এগিয়ে যায়। দেশে সব ভারতীয়র জন্য একরকম আইন থাকলে দেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলি ভোটব্যাংকের রাজনীতি করতে পারবে না। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধাঁচা আরও শক্ত হবে। তখনই বলা যাবে— 'ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, মানে ভারত কোনো ধর্মের পক্ষপাত করে না'। আবার একই রকম কাজে 'ধর্ম দেখে দুইজনের দুইরকম বিচার বা একটা বিশেষ ধর্মের পক্ষ নিয়ে বিচার করা বা রায় দেওয়া'— এইসবের বিলুপ্তি ঘটবে। ইউসিসি লাগু হলে ভারতের মহিলাদের অবস্থান আরও ভালো হবে। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'— এই কথাটির সঠিক বাস্তবায়ন হবে। দেশের অর্ধেক মানুষ মানে মহিলাদের যদি উন্নতি ঠিক মতো না হয় তাহলে সেই দেশ সঠিক ভাবে উন্নতি করতে পারে না, সেই সমাজের সঠিক উন্নতি হয় না। কারণ কোনো কোনো ধর্মে মহিলাদের উপর বিভিন্ন রকমের বিধি নিষেধ আছে। অন্যান্য ধর্মের মহিলাদের মতে তাদের ধর্মের মহিলারা সেইরকম সুযোগ সুবিধাও পায় না।

ইউসিসি-র বিরোধিতা যারা করছে তাদের মতে এই আইন চালু হলে নাকি সব ধর্মের মানুষের উপর হিন্দু আইন বলবৎ হবে। দেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ধাঁচা নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। অন্য ধর্মের উপর আঘাত আসবে। ভারতের একতা ও অখণ্ডতা নষ্ট হবে ইত্যাদি। যদিও এসব ধারণা বা চিন্তাগুলি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্ত। বরং উলটোটাই হবে। দেশের একতা, অখণ্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পারে। ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। হিন্দুরা যদি নরবলি প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ বিলোপ করতে পারে ও বিধবা বিবাহ মেনে নিয়ে হিন্দু ধর্মকে যদি আরও উদার এবং আধুনিক করে তুলতে পারে এবং বিশ্বে যদি এর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে অন্য ধর্মের লোকেরাও আশা করি তাদের সমাজের কিছু পুরাতন রীতি নীতি যেগুলি তাদের সমাজে না থাকলে তাদের সমাজ আরও আধুনিক ও উদার হবে, সেই রীতিনীতিগুলির সংস্কার করতেই পারে। এটা তাদের সমাজের সংস্কারমূলক চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ হবে। হিন্দু পুরুষরা যদি একটি বিয়ের আইনকে মানতে পারে, তাহলে বিশেষ সম্প্রদায় একটি বিশেষ আইনকে মানতে পারবে না কেন? হিন্দুরাও তো বলতে পারতো তাদের সমাজে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল।

তাছাড়া ইরানের মতো কট্টর ইসলামি দেশ যদি তাদের 'পার্সোনাল ল'তে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে ভারতের মুসলমানরা তা না পারার কারণ থাকলে তা হবে একমাত্র রাজনৈতিক কারণ। জহরলাল নেহরু যদি হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও 'হিন্দু কোড বিল' চালু করতে পারে, তাহলে দেশের একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও বা কিছু রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা দেশের বেশিরভাগ মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে ভারতে ইউসিসি আইন চালু হতেই পারে। যারা বলছে ইউসিসি বা দেশের সব মানুষের জন্য একরকম আইন চালু হলে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে— সেটা ঠিক না। একটা সংসারে বা পরিবারের সব সন্তানের জন্য যদি সমানতা নয়। থাকে বা সেই পরিবারের একেক সন্তান যদি সম্পত্তি ভাগের সময় বা অন্য কিছু একটা ভালো কাজের সময় সমান ভাগ বা সমান সমান অধিকার না পায় সেই পরিবারের সন্তানদের মধ্যে কি হৃদ্যতা, একতা বা ভালোবাসা থাকে? নাকি যে পরিবারের সব সন্তানই সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারাই হোক বা অন্য কিছু ভালো কাজ হোক সব কিছুতেই সমান অধিকার বা সমান ভাগ পায়— সেই সংসারের সন্তানদের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, একতা বা সখ্য বেশি থাকে?

পশ্চিমবঙ্গের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকাশে কেন্দ্রীয় নজর

দেবযানী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গের এক সংবাদপত্রে গত ২৭ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে একখানি বিস্তারিত রিপোর্ট ছিল। এমন রিপোর্ট এ রাজ্যের সংবাদপত্রগুলিতে সচরাচর দেখা যায় না। ‘নন-কমিটেড রেভেনিউ এক্সপেন্ডিচার’ অর্থাৎ দানধ্যানের রাজনীতির সংবাদ প্রায় প্রত্যহ পাওয়া গেলেও ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বা পরিকাঠামো খাতে ব্যয়ের সংবাদ এ রাজ্যে পাওয়া যায় নিতান্ত কালেভদ্রে। ওই রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গেল যে ২০১৬ সালে কলকাতা পুর এলাকার নিকাশি নালা সংস্কারের কাজ পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল এ রাজ্যের সরকার।

রিপোর্টটিতে নানা প্রকারে বলা হয়েছিল যে বর্জ্য পদার্থ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার না করে মানুষের দ্বারা তা পরিষ্করণের যে অমানবিক ও সভ্যতাবিরোধী বন্দোবস্ত বহুকাল যাবৎ এদেশে চলে আসছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটেও তা কম নয়, কারণ এ বছরে ১ মে গুজরাট হাইকোর্টের তরফ থেকেও কড়া বার্তা এসেছে এই মর্মে যে, ‘ম্যানহোলে কোনও মানুষকে (নিয়ম ভেঙে) নামালে, সংশ্লিষ্ট পুরসভা বা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ গুজরাটের বিষয়ে এ রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলির একখানি বিশেষ নজরদারি থাকে যাকে নিন্দনীয় বলা যায় না, কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা গুজরাট এগিয়ে। ফলে গুজরাটের দিকে নজর রাখলে নিজেদের উন্নতির সম্ভাবনাও ত্বরান্বিত করার আশা করা যায়।

ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘সাফাইকর্মীদের জন্য তৈরি সরকারি কমিশনের রিপোর্ট বলছে, ১৯৯৩ থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (২৯ বছরে) ৯৮৯ জন সাফাইকর্মী মারা গিয়েছেন ম্যানহোল বা নর্দমায় নেমে। এই তালিকায় সবার উপরে তামিলনাড়ু (২১৮ জন)। তার পরেই নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট (১৫৩)। কী অবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের? ২৯ বছরের মৃত্যুতালিকায় পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ১০ নম্বরে। মৃতের সংখ্যা এ রাজ্যে ২৩। দু’ বছর আগে রাজ্যের রাজধানী শহরে চার জনের মৃত্যুর পর সরকার থেকে পুরসভা সকলেই নড়েচড়ে বসেছিল। তারপর এমন মৃত্যুর ঘটনা আর ঘটেনি— এ থেকে মনে হতে পারে যে এ রাজ্যের তুলনায় গুজরাট রাজ্যের সাফাইকর্মীদের পরিস্থিতি বুঝি-বা এ বিষয়ে অনেক বেশি প্রতিকূল যদিও বাস্তব পরিস্থিতি তেমন নয়। সাফাইকর্মীদের জন্য তৈরি সরকারি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৩ থেকে ২০২২-এর ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে গুজরাটে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ১৫৩ নয়, ১৩৬ এবং পশ্চিমবঙ্গে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ২৫। ১০ জন ম্যানুয়াল সাফাইকর্মী পশ্চিমবঙ্গে মারা গিয়েছেন ২০১৯ থেকে ২০২২-এর জুন মাসের মধ্যে। অর্থাৎ মাত্র চার বছরে পশ্চিমবঙ্গে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা যেখানে ১০, সেখানে ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ২৫ বছরে এ রাজ্যে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫, এই তথ্যের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের ম্যানুয়াল সাফাই চিত্রের প্রকৃত তুলনা করতে সাহায্য করবে।

২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে গুজরাটে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ১৪ + ৫ = ১৯ যেখানে ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ২৫ বছরে গুজরাটে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ১৩৬---১৯ = ১১৭। অর্থাৎ প্রথম ২৫ বছরে গুজরাটে বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা গড়ে ৪.৬৮টি আর পরবর্তী ৪ বছরে সেই গড় ৪.৭৫। প্রথম ২৫ বছর থেকে পরবর্তী ৪ বছরে গড় বার্ষিক মৃত্যুর শতকরা বৃদ্ধি গুজরাটে ১.৪৯ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ৬ + ৪ = ১০ যেখানে ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মৃত সাফাইকর্মীর সংখ্যা ২৫--১০ = ১৫ জন। অর্থাৎ প্রথম ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যার গড় ০.৬ আর পরবর্তী ৪ বছরে সেই গড় ২.৫। গড় বার্ষিক মৃত্যুর শতকরা বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গে ৩১৬.৬৬ শতাংশ। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেন্ডটি বিপজ্জনক। নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটে যেখানে গত ২৯ বছরে ম্যানুয়াল সাফাইকর্মীর বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যার শতকরা হারে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটেনি, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে গত চার বছর বাৎসরিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩১৬.৬৬ শতাংশ। এই তথ্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ব্যর্থতার নির্দেশক। এই ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল আদালতের একটি পর্যবেক্ষণেও।

গত সেপ্টেম্বরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা ও বর্জ্য নিষ্কাশনের যথাযথ উদ্যোগে অবহেলার কারণে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জরিমানা করে ৩,৫০০ কোটি টাকা। জরিমানার এই পরিমাণ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দের (প্রায়) সমান। প্রশ্ন হলো— পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জরিমানা করা হলো কেন? আদালতের পর্যবেক্ষণে সলিড ও লিক্যুইড বর্জ্য পদার্থ এ রাজ্যে দৈনিক যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ততখানি বর্জ্য পদার্থের ট্রিটমেন্ট বা প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট এ রাজ্যে নেই। প্রতিদিন শহরাঞ্চলে উৎপন্ন হচ্ছে ২,৭৫৮ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য, যেখানে ৪৪টি বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে রয়েছে দৈনিক মাত্র ১৫০৫.৮৫ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থাপনা। আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও উল্লেখিত হয়েছে যে এই ১৫০৫.৮৫ মিলিয়ন লিটার বর্জ্যর মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে দৈনিক মাত্র ১২৬৮ মিলিয়ন লিটার বর্জ্যের, বাকি ১৪৯০ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য পদার্থ কোনো প্রকার ট্রিটমেন্ট ছাড়াই প্রতিদিন গিয়ে মিশছে নদীর জলে। অর্থাৎ গুজরাট বা তামিলনাড়ুর তুলনায় সাফাইকর্মীর মৃত্যুর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে কম হওয়ার অন্যতম কারণ এও হতে পারে যে এ রাজ্যে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্কাশনের কাজটিই যথাযথভাবে হচ্ছে না।

২০২১ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত দশকটি রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে ইকোসিস্টেম রেস্টোরেশনের দশক বলে চিহ্নিত হয়েছে। গঙ্গাদূষণ রোধ ও গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করার পরিকল্পনায় ২০১৪ সাল থেকে ভারত সরকার নিয়েছে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্প। প্রথম আট বছরে এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক সাফল্য ও প্রকল্পটির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ দেখে 'নমামি গঙ্গে' হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণে রাষ্ট্রপুঞ্জের দশটি ফ্ল্যাগশিপ মডেলের একটি, পেয়েছে ওয়ার্ল্ড রেস্টোরেশন ফ্ল্যাগশিপের তকমা। অর্থাৎ যে সময় গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে একজোট হয়ে কাজ করছে গঙ্গা অববাহিকার সমস্ত রাজ্যগুলি এবং সেই উদ্যোগ পেয়েছে বৈশ্বিক স্বীকৃতিও, পশ্চিমবঙ্গ তখন অপরিষ্কৃত, প্রক্রিয়াকরণহীন বর্জ্য নদীতে ফেলে গঙ্গাদূষণের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে।

সাফাইকর্মীদের জন্য তৈরি সরকারি কমিশনের উক্ত রিপোর্টে এও উল্লেখিত হয়েছে যে ২০১৩ ও ২০১৮ সালে ভারতের সকল রাজ্যে সার্ভে করে মোট ৫৮,০৯৮ জন ম্যানুয়াল সাফাইকর্মীকে চিহ্নিত করা হয়, যাদের মধ্যে গুজরাটে ম্যানুয়াল সাফাইকর্মীর সংখ্যা ১০৫ জন আর পশ্চিমবঙ্গে ৬৮০ জন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের হাতে বর্জ্য পরিষ্করণের কাজ করেন এমন মানুষের সংখ্যা গুজরাটের সাড়ে ছয় গুণ। দুই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার নিরিখে হিসাব করলে, প্রতি ১০০ জন বাসিন্দা পিছু গুজরাটের তুলনায় সাড়ে চার গুণ বেশি লোক পশ্চিমবঙ্গে ম্যানুয়াল সাফাইকর্মীর কাজ করেন। এই প্রকার তথ্য পশ্চিমবঙ্গের গৌরবের পরিপন্থী। গুজরাটও বর্জ্য পরিষ্করণ ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল সাফাইকর্মীর চাহিদা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু জনসংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে সে চাহিদা গুজরাটের সাড়ে চার গুণ।

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের বর্জ্য পরিকাঠামোর এক সুবৃহৎ অংশ ব্রিটিশ আমলের যে প্রকার পরিকাঠামো গুজরাটে ছিল না। গুজরাটের বর্জ্য পরিকাঠামো সম্পূর্ণই স্বদেশ নির্মিত এবং গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে তা উন্নত হয়েছে। উপরন্তু

এও স্মরণে রাখা কর্তব্য যে গুজরাট গঙ্গা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত নয়। ফলে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের অধীনে বর্জ্য পরিকাঠামো খাতে যে প্রকার অনুদান ও প্রযুক্তি সহায়তা পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে এবং পেয়ে চলেছে, গুজরাট তা পায়নি।

'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামোর বিকাশে এগিয়ে এসেছে ভারত সরকার। গত ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিয়ো কনফারেন্সে জানিয়েছিলেন যে এই রাজ্যের জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে ২৫টি বর্জ্য পরিকাঠামো প্রকল্প যার মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্পের কাজই শেষ হয়ে গিয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন ৬১২ কিলোমিটার

নেটওয়ার্কের ৭টি বর্জ্য পরিকাঠামো প্রকল্প, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০টি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট বা এসটিপি। এই প্রকল্পগুলি বাবদ খরচ হয়েছে ৯৯০ কোটি টাকার বেশি এবং এগুলি নবদ্বীপ, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, বজবজ, বারাকপুর, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, উত্তরপাড়া-কোতরং, বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর, নৈহাটি, গারুলিয়া, টিটাগড় ও পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলগুলির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধন করবে। এই নতুন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টগুলি পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা (সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট ক্যাপাসিটি) বৃদ্ধি করবে ২০০ মিলিয়ন লিটারেরও বেশি। অর্থাৎ ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে যে ঘাটতি এ রাজ্যের শহরাঞ্চলে ছিল, তার বেশ খানিকটা পূরণ হবে এগুলির দ্বারা।

একই দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (এনএমসিজি) প্রকল্পের অধীনে ৮০ কিলোমিটার নেটওয়ার্কের আরও ৫টি নতুন বর্জ্য পরিকাঠামোর শিলান্যাস করেন যার জন্য খরচ হতে চলেছে আনুমানিক আরও ১,৫৮৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে আরও ১৯০ মিলিয়ন লিটার এবং এগুলি বিকাশ সাধন করবে উত্তর ব্যারাকপুর, হুগলী-চুঁচুড়া, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকা, গার্ডেনরিচ ও মহেশতলা টাউন এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার। এই সঙ্গে গঙ্গার এক উপনদী কলকাতার আদিগঙ্গা তথা টালিনালাকে দূষণমুক্ত করার বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (এনএমসিজি) প্রকল্প থেকে বরাদ্দ করেছেন আনুমানিক ৬৫৩.৬৭ কোটি টাকা যা ব্যয়িত হবে ৩টি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট তৈরিতে যেগুলির এক একটি দৈনিক যথাক্রমে ১১.৬০ মিলিয়ন লিটার, ১০ মিলিয়ন লিটার এবং ৩.৫ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে এ রাজ্যের এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে রিপোর্টের কথা দিয়ে এই প্রতিবেদন শুরু করেছিলাম, সেই রিপোর্টে বার কয়েক উল্লেখ করা হয়েছিল যে পুরসভার অর্থকষ্ট ছিল বলে কলকাতা পুর এলাকার নিকাশি নালা সংস্কারের কাজ পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর করতে ২০১৬ সালে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু উপরে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিকাঠামো প্রকল্পের সবকটির মোট অর্থমূল্য বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে ১০০ কোটি টাকা এক্ষেত্রে যৎসামান্য। নানা ধরনের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্কাশনের আধুনিক বিকশিত পরিকাঠামো শহরাঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করার জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকেও প্রয়োজনানুগ অর্থ বরাদ্দকরণ আবশ্যক।

গুজরাটের সঙ্গে উপযুক্ত তুলনা করলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে গুজরাট যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকাশে ধীর অথচ দৃঢ় পায়ে নিজের জোরে এগিয়ে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে ব্রিটিশ আমলের পরিকাঠামোর জোরে এতদিন চালিয়ে অতি সাম্প্রতিক অতীতকাল থেকে ধ্বসে পড়ছে। ভারত সরকারের সহায়তায় এবং রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে রাজ্যের বর্জ্য পরিকাঠামোর বিকাশে মনোনিবেশ না করলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হাল হতে পারে ভয়াবহ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময় থাকতে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আবশ্যক। □

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে বাংলাদেশ ভারতের সাহায্য চেয়েছে

শিতাংশু গুহ

শেখ হাসিনার কঠোর অবস্থান নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, নিতেই হতো। অনেকে এটিকে একাত্তরের সঙ্গে তুলনা করতে চান। ৭১-এ ভারত-রাশিয়া পক্ষে ছিল, আমেরিকা-চীন বিপক্ষে। এবার চীন পক্ষে। কিন্তু অর্থনৈতিক সহায়তা ছাড়া চীনের করার কী আছে? চীন কখনো কি কাউকে সাহায্য করেছে? ৭১-এ পাকিস্তানকে কি সাহায্য করেছিল? একাত্তরে ছিল যুদ্ধ, এবার নির্বাচন। চীন-রাশিয়া- আমেরিকা শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে জিততে সহায়তা করতে পারবে না; ভারত পারবে। ২০১৪, ২০১৮-তে করেছে। একজন আমায় জানালেন, এবার নির্বাচন সুষ্ঠু হবে, বিতর্ক হবে না, শেখ হাসিনা জিতবেন।

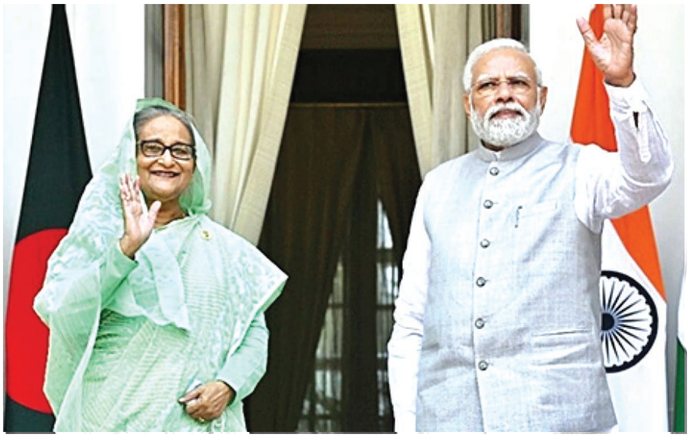

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ভারতের সাহায্য চেয়েছে। স্পষ্টত ভারত শেখ হাসিনার পক্ষে লবিং করবে। ইতিমধ্যে মোদীর আগমন উপলক্ষ্যে ভারত-মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের যৌথ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠেছে। ভারত হয়তো আমেরিকাকে বোঝাতে চাইবে যে, শেখ হাসিনাকে বেশি ঘাঁটালে তিনি চীনের দিকে ঝুঁকতে চাইবেন। রাশেদ খান মেনন বলেছেন, আমেরিকা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ চাইছে, খান সাহেব হয়তো জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে চাইছেন। বাংলাদেশ সেন্ট মার্টিন কাউকে দেবে না, ভারত চাইবে না তাঁর 'নাকের ডগায়' বসে কেউ খবরদারি করুক।

বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে অন্য খেলা চলছে। এ খেলায় আমরা দর্শক। ভারত যদি আমেরিকাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় অথবা আমেরিকা-ভারত যদি বাংলাদেশ প্রশ্নে দুই শিবিরে বিভক্ত থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এর মধ্যে বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ ব্রিক্স জোটে যোগ দিতে পারে। আমেরিকা এটি কীভাবে নেয়, তা দেখার বিষয়। ব্রিক্স নিয়ে আপাতত এটুকু বলা যায়, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে বেশি খাতির আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা জাপান খুব একটা ভালো চোখে দেখবে না।

ভারতের নিজস্ব সমস্যা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে। আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে যাবে না, কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হবে না, এমন গ্যারান্টি নেই। মোদীর আসন্ন ওয়াশিংটন সফর এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ফাইনাল খেলা সম্ভবত হবে সেপ্টেম্বরে ভারতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে। সেখানে বাইডেন-পুতিন-জিনপিং থাকার কথা। পর্যবেক্ষক হিসেবে শেখ হাসিনা সেখানে নিমন্ত্রিত। ইউক্রেনের অভিনেতা প্রেসিডেন্ট জিলেনসকি'র ভুলে দেশটিতে প্রক্সি যুদ্ধ চলছে। শেখ হাসিনা ঝানু রাজনৈতিক, বাংলাদেশকে তিনি পরাশক্তির 'ঝগড়ার ক্ষেত্র' হতে দেবেন না।

এর মধ্যে খারাপ খবর, 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার' (আরএসএফ) গোলাম রব্বানি নাদিমকে পিটিয়ে মেরে ফেলার বিষয়টি তদন্ত করার দাবি করেছে। নাদিম ১৫ জুন ময়মনসিংহের একটি হাসপাতালে মারা গেছেন। ৬ জন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানের চিঠির পর এবার ৬ জন ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যান প্রায় একই ধরনের চিঠি দিয়েছেন ফরেন সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন-কে। ডেমোক্র্যাট উইলিয়াম বিল কিটিং এক টুইটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

চীন বাংলাদেশের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিপক্ষে বলেছে। ৬ জন ইইউ পার্লামেন্ট সদস্য ইইউ ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ বোরেল-কে এক চিঠিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য ৬ কংগ্রেসম্যানের চিঠির অনুরূপ। কানাডা আগেই বলে দিয়েছে তারা আমেরিকার ভিসানীতি অনুসরণ করবে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে বিশ্ব-মোড়লদের চিন্তার শেষ নেই। সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিকরা ক্ষমতায় যেতে বা থাকতে বিদেশের কাছে ধরনা দিয়েছেন। সেই ধারা এখনো বজায় রয়েছে। সত্য হচ্ছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে আওয়ামি লিগ বা বিএনপি কখনোই আন্তরিক ছিল না, এখনো নয়।

যোগের প্রসারে ক্রীড়া ভারতীর ভূমিকা

দেবাশিস বিশ্বাস

২০১৪ সালে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ২০১৫ সাল থেকে ২১ জুন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। যোগ হলো শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের এক যোগসূত্র— যা প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ২০১৪ সালে তার জাতিসঙ্ঘের ভাষণে ২১ জুন তারিখের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ এটি উত্তর গোলার্ধে বছরের দীর্ঘতম দিন এবং বিশ্বের অনেক অংশে এই দিনটিকে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে মানা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবের শুরুর সেই ২০১৪ সাল থেকে এই ২১ জুন দিনটিতে সমবেতভাবে যোগ দিবস পালনের অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে স্থাপিত 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সমিতি'-র তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানটি হয়ে আসছে। সেই সময় থেকেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্রীড়া ভারতী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে মিলে যোগ দিবস পালনের জন্য যোগ অভ্যাস অনুষ্ঠান করে চলেছে।

প্রথম বছর থেকেই এই অনুষ্ঠানের চিফ প্যাট্রন হিসেবে পেয়েছি রাজ্যপাল মহোদয়কে (যিনি যখন পদে থাকছেন)। এছাড়া আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন যোগা অর্গানাইজেশন, খেলাপ্রেমী মানুষ। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছেন। এটাও উল্লেখযোগ্য যে জাতপাত, ধর্মাধর্ম, উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ সরিয়ে রেখে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন এসে একসঙ্গে যোগ অভ্যাস করেছেন। অত্যন্ত খুশির বিষয় যে সেই ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর এই যোগ দিবস নিয়ম করে আমরা পালন করে আসছি। শুধু করোনার অতিমারির মধ্যে একবার আমরা এই অনুষ্ঠান অনলাইনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আর আরেকবার গভর্নর হাউসে হয়েছিল।

ক্রীড়া ভারতী যে শুধু এই একদিনই যোগ দিবস পালন করে তা নয়; সারা দেশ জুড়ে ক্রীড়া ভারতীর অসংখ্য ক্রীড়া কেন্দ্র রয়েছে। সারা বছর ধরে এই অসংখ্য ক্রীড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত স্তরে যোগ বা স্বাস্থ্যচর্চা পৌঁছানোর নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। সেসব ক্রীড়া কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে যোগাভ্যাস যেমন হচ্ছে, তেমনই যোগ প্রশিক্ষকদের জন্যেও বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়মিতভাবে যোগ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করে চলেছে। বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০০ যোগকেন্দ্র চলছে এবং এটা ক্রমবর্ধমান। অতি সম্প্রতি বোলপুরে যোগ শিক্ষক শিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। যারা এখানে শিক্ষা পেলেন তারা যাতে যোগ অভ্যাসকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারেন সেই লক্ষ্যে।

আর শুধু এটাই নয়, ক্রীড়া ভারতীর অসংখ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটা একটা মাত্র। আমরা ভারতবর্ষ জুড়ে যতরকম খেলাধুলো আছে বা খেলাধুলা হয় সেই সব খেলার উন্নতি, প্রচার প্রসার এবং তার সঙ্গে খেলাধুলা সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ত্রীড়া ভারতী বদ্ধপরিকর। আমাদের লক্ষ্য ভারতবর্ষের প্রতিটা গ্রামে খেলার ময়দান থাকবে এবং প্রতিটি ময়দানে সমস্ত রকম খেলাধুলা হবে। আমাদের দেশের যুবক, কিশোর , শিশুরা প্রত্যেকে খেলাধুলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। সমস্ত রকম প্রচলিত খেলা তো বটেই, বিশেষ করে বর্তমানে অপ্রচলিত বিভিন্ন গ্রামীণ খেলা, কিংবা প্রাচীন খেলা আমাদের লক্ষ্য। ক্রীড়া ভারতী শুধুমাত্র কোনও নির্দিষ্ট একটা খেলার কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। সমস্ত খেলার মাথার উপর একটা ছাতার মতো এই ক্রীড়া ভারতী। ক্রীড়া ভারতীকে বলা যেতে

পারে একটা সামাজিক সংগঠন, যেখানে বিভিন্ন ধারার খেলোয়াড়রা এসে যোগ দিতে পারে, তাদের খেলাধুলাকে আরও উন্নত করতে পারে, তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারে এবং খেলাধুলা সংক্রান্ত নিজস্ব মতামত রাখতে পারে।

যোগ কার্যক্রম ছাড়াও ক্রীড়া ভারতী সারা ভারতে প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে। প্রথাগত খেলাধুলা যেমন ফুটবল ক্রিকেট ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন পারম্পরিক খেলাগুলোকে যেমন— মালখাম্ব, (the game of power and perfect balance) পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা, তাদের মধ্যে সেসব খেলা সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা— এই কাজটাও ক্রীড়া ভারতী করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে খেলাধুলার মাধ্যমে চরিত্র গড়ে ওঠে এবং চরিত্রের মাধ্যমে দেশ গড়ে ওঠে। চরিত্রের দৃঢ়তার ওপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ভারত খেলাধুলাতে বিশ্বের দরবারে অনেক পিছিয়ে আছে, বিশ্বে আমাদের স্থান ৬৭তম। আমরা চাই ভারত খেলাধুলাতে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসুক। World Heath Organisation বা WHO-এর রেকর্ড অনুসারে স্বাস্থ্যেও ভারত অনেক পিছিয়ে আছে। ক্রীড়া ভারতী বিশ্বাস করে Fit India Healthiest India। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে সারাদেশে ক্রীড়া ভারতী কাজ করে চলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা আমরা প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকশো ক্রীড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্রীড়া ভারতী এই কাজ করছে। আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীও ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট নিয়ে এসেছেন। ক্রীড়া ভারতী চায় স্পোর্টস অপশনাল নয় কম্পালসারি হোক। আমরা খুশি যে নতুন শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রীয় সরকার স্পোর্টসকে কম্পালসারি আইটেম হিসাবে মান্যতা দিয়েছে।

খেলাধুলা সংক্রান্ত অসংখ্য অনুষ্ঠান আমরা প্রতিনিয়ত করে চলেছি। যেমন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মোটরসাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে একই দিনে সমগ্র ভারত পরিক্রমা হয়েছে। একই সময়ে ৬৬৭টি স্থান থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে আরোহীরা ভারত পরিক্রমা করেছেন। এই পরিক্রমার উদ্দেশ্য একটাই— ক্রীড়া ভারতী দেশের সব মানুষের মধ্যে এক ভারত— এই ভাবনা, সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করেছে। অন্যান্য সমস্ত রকম অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিজও ক্রীড়া ভারতী করে, যেমন সাইকেল র‍্যালি, পর্বতাভিযান। ক্রীড়া ভারতী চায় দেশের যুব সম্প্রদায় যত বেশি নিজেদেরকে খেলাধুলার মধ্যে ব্যস্ত রাখবে ততই আগামী প্রজন্ম তাদের মানসিক ও শারীরিক দৃঢ়তা পাবে। বিভিন্ন দেশের যুব সম্প্রদায়ের কিছু অংশ বিভিন্ন নেশার দ্রব্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। খেলাধুলার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলে শুধু স্বাস্থ্য নয় মানসিক গঠনও এত সুন্দর ও দৃঢ় হবে যে দেশের যুব সম্প্রদায় নিজেদেরকে মাদক ইত্যাদি নানারকম নেশাদ্রব্য, অপরাধ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

এছাড়াও এটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের সংবাদ যে এ বছর মহাবীর স্বামীর ২২৫০তম মহানির্বাণ বর্ষ। ভগবান মহাবীরের জীবন দর্শন, তাঁর আদর্শ, তাঁর বাণী আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাই। মহাবীর সাধারণ মানুষের মন, স্বাস্থ্য, শান্তি, শিক্ষার জন্য যেসব কাজ করেছেন তা সবাই জানুক। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে যে এত হিংসার দাপাদাপি, উন্মত্ততা সেখানে মহাবীরের সেই অহিংসার ভাবধারা, তা যদি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে হয়তো আগামী দিনে আমরা এক শান্ত পৃথিবী দেখতে পাব। আজ মহাবীরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে একটি পুস্তিকা আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে আমাদের মধ্যে পরম পূজ্য আচার্য এসেছেন, তিনি মহাবীরের সম্বন্ধে কিছু কথা আমাদের বলবেন যা আমাদের ভাবধারাকে আরও উন্নত করবে, আমরা হয়তো কিছু শান্তির দিশা পাবো।

এছাড়াও এই বছর আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০তম জন্মজয়ন্তী। স্বাধীনতা আন্দোলনে আর্য সমাজ এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ভূমিকা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ক্রীড়াভারতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য সমাজের ভাবনা, চিন্তাধারা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা ইত্যাদি ব্যাপারে আলোকপাত করবে। আজ আর্য সমাজের তরফ থেকে বিশিষ্টজনেরা এসেছেন। তাদের তরফ থেকে আর্য সমাজ এবং সমাজের ভূমিকা এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনী ও আদর্শ নিয়ে একটি পুস্তিকা সবার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

(লেখক ক্রীড়া ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সঙ্কট

মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসার মিলিত সুন্দর রূপ হচ্ছে গণতন্ত্র। মাকু-সেকুদের মুখে শুধু ধনতন্ত্র-গণতন্ত্র, মেহনতি মানুষদের নিয়ে বড়ো বড়ো বিপ্লবের কথা। হার্মাদ/লেঠেল/বন্দুক বাহিনীদের মৃত্যু মিছিলে উল্লাসের তাণ্ডব দেখলাম। তাদের লড়াই দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম। তখন দিনগুলো রাতের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। আজ এখন তারা ইতিহাস মাত্র। হার্মাদ বাহিনী থেকে তৃণমূলের জল্লাদ/ক্রিমিনাল/বন্দুক বাহিনীদের সেই খেলা এখনো সমানভাবে চলছে। সুস্থ গণতন্ত্রের জন্যে মমতা ব্যানার্জির প্রাণপাত দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তৃণমূলের খেলা দেখে আমরা আবার ক্লান্ত। গণতন্ত্র তো পুষ্পবৃষ্টির মতো আশীর্বাদ হয়ে আমাদের মাথার উপর ঝরে পড়বে জানি। মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসার মিলিত সুন্দর রূপ হচ্ছে গণতন্ত্র। তিনি যদি সত্যি কলকাতাকে লন্ডন করতে চাইতেন, অনায়াসে তিনি একটা সুন্দর গণতন্ত্র উপহার দিতে পারতেন। তিনি কি কখনো গণতন্ত্র নিয়ে ভাবেননি? তিনি হয়তো কখনো ভেবেছিলেন আমাদের মতো। কলকাতার রাস্তাঘাট যদি কখনো লন্ডনের মতো হয়, আমাদের মানসিকতা কি কখনো পরিবর্তন হবে লন্ডনের মতো? তা কোনোদিন হয়তো হবে না। তবুও তিনি ভেবেছিলেন। এই সরকারের প্রথম জমানায় আমরা এই প্রিয় শহরে ঢুকতাম রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে। গঙ্গার সবুজ পাড়ে বসে মুক্ত বায়ু সেবন মুক্তির স্বাদ দেয় বইকী। যদিও সেগুলো এখন আর নেই। যিনি এমন সুন্দর চিন্তার অধিকারিণী তিনি একটা সুন্দর গণতন্ত্র বঙ্গবাসীকে উপহার দিতে পারতেন না? গণতন্ত্রের অঙ্গ নির্বাচন। সে একটা উৎসব। সেই উৎসব এখন নাকি তৃণমূলের নির্বাচনী খেলা। তাই নির্বাচন এলে খেলা শুরু হয়। নির্বাচন মানে মৃত্যু-মৃত্যু খেলা। অন্যান্য নির্বাচন যদি মহাভারতের যুদ্ধ হয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে মহাভারতের মুষল পর্ব। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে আমরা সবাই আত্মঘাতী। এমন নির্বাচন সত্যি কি কাম্য?

কাটমানি কালচার থেকে শুরু করে দুর্নীতিতে ভরা সরকারের সারা শরীরে পচন শুরু হয়েছে। উঁচুতলার বেশ কয়েকজন সদস্য এখন জেলে। মনে হয় চোরদের সরকার। এই চোরদের শাস্তি দিতে হাইকোর্টকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোর্ট শাসিত এই রাজ্য। বাঙ্গালি কালচার বিরোধী ভাষা সন্ত্রাসের সঙ্গে শরীর নিয়ে বিকৃত, কুরুচিকর মন্তব্য নির্বাচনী বক্তব্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নড়বড়ে গণতন্ত্রে নাকি এরকমই হয়। ইংল্যান্ডের মজবুত গণতন্ত্র তাদের চালিকা শক্তি। তাদের মানসিকতার সঙ্গে তাদের গণতন্ত্র বেশ মানানসই। তাই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে পদত্যাগ করতে হয় যখন তিনি দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে ব্যর্থ হন। আমাদের এখানে মন্ত্রীদের পদত্যাগের কথা কখনো ভাবা যায়? গণতন্ত্রের যদি উদাহরণ দিতে হয় ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিতে হবে যা আমাদের দেশে কখনো ভাবা যায় না। গণতন্ত্রের সেই সুন্দর রূপ এখানে কোথায়? এমন গণতন্ত্রে জনগণের মোহভঙ্গ হয়। দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করতে করতে আমাদের গণতন্ত্র এখন পচনশীল, মরণ দশায়। সরকার স্পন্সর্ড সন্ত্রাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন কখনো নিরপেক্ষ হয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী কখনো এলেই-বা কী? পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনতার সঙ্গে জনতার মারপিট, একে অন্যের জায়গায় ঢুকে বাঘ-কুমিরের লড়াইয়ের মতো কেন্দ্র বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের মারপিট কখনো দেখেছেন? আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন পঞ্চায়েতের মুষলপর্ব শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মহাযুদ্ধ বলে কথা।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দিবস

যুগে যুগে কত না মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। ১৯২৭ সালে বিলেতে ব্যারিস্টারি পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩৪ সালে। ১৯৪০-৪৪ সালে তিনি অখিল ভারত কার্যকারী সভাপতি এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। কার্জন ও মিন্টো এ ব্যাপারে মুসলিম লিগকে সক্রিয় করেন। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস অদ্ভুত ভাবে লখনউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মুসলিম লিগের দাবি মেনে নেয় এবং রাজনৈতিক ভাবে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। জন্মলগ্ন থেকেই মুসলিম লিগের নেতারা কংগ্রেসের নেতৃত্বকে হিন্দু নেতৃত্ব বলে সম্বোধন করতেন। আসলে মুসলিম লিগের ভিতরে হিন্দু বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল কংগ্রেসের নেতারা তা বুঝতেই পারেননি। ১৯১৯ সালে তুরস্কের খলিফার সমর্থনে মুসলমানদের সহিংস আন্দোলনকে গান্ধীজী সমর্থন করে একে স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

মুসলিম লিগের কট্টর হিন্দু বিরোধিতা ড. শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন গড়ে তুলে ফজলুল হকের পাশে দাঁড়ালেন এবং গঠিত হলো শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা। জন হারবার্ট চেয়েছিলেন বাঙ্গলার ক্ষমতা মুসলিম লিগের হাতেই থাকুক। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গান্ধীজী-সহ বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ফলে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা শুরু করে মুসলিম লিগ গভর্নর জন হারবার্টের প্ররোচনায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দায়িত্ব দেওয়া হয় সোহরাওয়ার্দিকে। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতা শহর ৭২ ঘণ্টার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। বিপুল প্রাণ ক্ষয় হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের

ফ ঃ ৩

হাত বাড়িয়ে দেন। হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে পাকিস্তানের কবল থেকে উদ্ধার করে অবিভক্ত বঙ্গের একাংশ, পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভারত ভুক্ত করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদের এই অবদান চিরস্মরণীয় এবং তাই আজ এই পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
প্রথম খণ্ড শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা-২।

পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে তো?

সরকার গঠিত হয় মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য। সরকার শপথ নেয় নিরপেক্ষ ও ভয়মুক্ত ভাবে মানুষের সেবা করার জন্য। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেখে শপথের কথাগুলোকে এখন রসিকতা বলে মনে হয়। এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কেন আজ মুখ্যমন্ত্রী ও নির্বাচন কমিশনের কথার পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কমিশন বলছে তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর কোনো মৃত্যুর খবর নেই। পুলিশ তাকে কোনো মৃত্যুর সংবাদ দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ও সঙ্গে পুলিশ মন্ত্রীও। তিনি ১৬ জুনের দলীয় সভায় জানান মনোনয়ন পর্বে তার দলের দুজন খুন হয়েছে। তাহলে নির্বাচন কমিশনকে ওই মৃত্যুর সংবাদ পুলিশ কেন দিল না? এর দায় তো পুলিশ মন্ত্রীকে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সব জানাতে হবে। এভাবে মানুষকে নিয়ে খেলা চলবে না। দেশের সংবিধান এই অধিকার কাউকে দেয়নি। মমতা ব্যানার্জির এই ডোন্টকেয়ার মনোভাব তুলে ধরা আজ খুব প্রয়োজন। তাতে বেশ কিছু মায়ের কোল খালি হলেও হোক। নির্বাচনে যত রকমের হিংসা ভয় ভীতি সব কিছুই পুলিশের মদতে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী অনবরত করে চলেছে। পুলিশ চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

মমতা ব্যানার্জি নিজে ও তাঁর সরকার যত রকমের অপকর্ম আছে তা করে চলেছে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের এ রাজ্যে জামাই আদরে বসিয়েছে। রোহিঙ্গারা তাদের হিংস্র স্বভাবের জন্য তাদের দেশ থেকেই বিতাড়িত হয়েছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে সকল স্থানে রোমহর্ষক হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেই ক্যানিং, ভাঙড়, মুর্শিদাবাদ, মালদহে, দিনহাটায় সংখ্যায় কারা বেশি চিন্তা করলেই ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব জেনে যারা চুপ করে বসে আছে তাদের মনে রাখতে হবে সোনার পাথর বাটি হয় না। রোগ উপর উপর না সারিয়ে রোগ গোড়া থেকে সারানো দরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু ওবিসিদের সংরক্ষণের সুযোগ ভোটের স্বার্থে তুলে দিয়েছে মুসলমানদের হাতে।

একদিন যে মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংসদে প্রতিবাদ করে স্পিকারের কাছে তার শাল ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আর আজ সেই মমতা ব্যানার্জি তাদের সব সুবিধা দিয়ে চলেছে। মনোনয়নের আগে দেশের মানুষ দেখেছে এই রাজ্যে শাসক দলের মদতে কীভাবে বোমা মজুত করা হয়েছে। বোমা কারখানায় বিস্ফোরণও হয়েছে তা আমরা সবাই জানি। দিনের পর দিন একের পর এক অন্যায় তৃণমূল করে চলেছে। আজ মানুষ অনেকটাই সজাগ হয়েছে। মানুষ দেখেছে দিনহাটায় রাজ্যের মন্ত্রী বসে থেকে কীভাবে ওখানে বিজেপি প্রার্থীদের নির্যাতন, হেনস্থায় মদত দিয়েছেন। এমনকী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ের উপর তির দিয়ে আক্রমণ করা হয়। যে রাজ্যে একজন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপদ নয় সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা তা সহজেই অনুমেয়। এমন একটা অবস্থা আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে রাস্তায় নেমে আক্রান্ত মানুষের পাশে ছুটে যেতে হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, এই নির্বাচনে হিংসার অবসান হবে। তাই তিনি রাজভবনে পিস রুম চালু করেছেন। সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে সেখানে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। রাজ্যপাল সেই অভিযোগ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এতে তৃণমূলের রাগ হলেও বাকি বিরোধীরা স্বাগত জানিয়েছে। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপে মমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কুঅভিসন্ধি দেখতে পাচ্ছেন। তিনি চান রাজ্যপাল ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকুন।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

পঞ্চায়েত ভোট

গণতান্ত্রিক দেশের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যম হলো ভোট। এক কথায় ভোট হলো গণতন্ত্রের বড়ো উৎসব। আমাদের দেশে তিন ধরনের নির্বাচন হয়। লোকসভা, বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই তিন ধরনের নির্বাচনের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামবাঙ্গলার মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে তারা তাদের এলাকায় জনগণের সুখ দুঃখের সঙ্গীকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। আসলে ভোট হলো এই পছন্দের গ্রহণযোগ্য কাজের ও কাছের মানুষকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া। আমাদের দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক দল মিলিয়ে কয়েকশো রাজনৈতিক দল আছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটের ময়দানে নামাতে পারেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কোনো ভারতীয় নাগরিক জনগণের স্বার্থে নিজেও ভোটে দাঁড়াতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দিনে দিনে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিকভাবে এখানে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবার বদলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই ভোট এলেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেতা, মন্ত্রী সবাই ভোটের ময়দনে নেমে পড়েন।

জনগণের পরিষেবা কেবলমাত্র ভোট আসলেই তাদের মনে পড়ে আর তখন সব পক্ষকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায়। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট গ্রামবাঙ্গলার মানুষের পছন্দের ও আপদে বিপদে পাশে থাকার গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি খোঁজার ভোট। তিন ধরনের ভোটের মধ্যে এই ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামবাঙ্গলার মানুষের উন্নয়নের জন্য ও তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য ১৯৭৮ সাল থেকে এই পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা চালু হয়। লোকসভা, বিধানসভার প্রতিনিধিকে গ্রামের মানুষ সবসময় কাছে পায় না। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানেরা গ্রামের মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এই পঞ্চায়েত ভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিমমেদিনীপুর।

ভারতের প্রথম মহিলা আইএএস আধিকারিক

আন্না রাজম মালহোত্রা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতের প্রথম মহিলা আইএএস আধিকারিক হলেন শ্রীমতী আন্না রাজম মালহোত্রা। সাধারণত দেখা যায় সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। একটি রিপোর্ট অনুসারে আমাদের দেশে প্রতি কুড়ি জন পুরুষ আইএএস অধিকারী থাকলে, মাত্র একজন মহিলা আইএএস আধিকারিককে আমরা দেখতে পাই। আবার অনেক মহিলা সরকারি আধিকারিকের জন্য আমরা গর্ববোধ করে থাকি।

স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবছর পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস (আইএএস) এবং পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস)-এ মহিলাদের যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। দেশে যোগ্য ও মেধাবী মহিলার সংখ্যা যথেষ্ট পমিাণে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের এই ব্যবস্থা সেবা থেকে দূরে রাখা ছিল চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয়।

তৎকালীন যুগে কেরালার আন্না জর্জ নাম্নী একটি অতি সাধারণ মেয়ে ওই পদে যোগদান করে জনসেবা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। ১৯৫১ সালে আন্না সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হন।

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে আন্না রাজম জর্জ কেরালার এর্নাকুলাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কোঝিকোড়ে স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে ইউপিএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হলে সেখানে স্বর্ণাক্ষরে উঠে আসে তাঁর নাম। তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থায় প্রবেশ করেন একজন মহিলা।

ইউপিএসসি দ্বারা পরিচালিত আরএন ব্যানার্জি এবং চারজন আইসিএস অফিসারের ইন্টারভিউ বোর্ডে তিনি একমাত্র মহিলা প্রার্থী ছিলেন। সেই সময় সেন্ট্রাল সার্ভিস এবং ফরেন সার্ভিসের মধ্যে তাঁকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি মাদ্রাজ ক্যাডার বেছে নেন। তবে তাঁর নিয়োগপত্রে কঠোরভাবে লিখিত ছিল— 'বিয়ের ক্ষেত্রে আপনার পরিষেবা বন্ধ করা হবে'। যদিও পরবর্তীকালে এই নিয়ম পরিবর্তন করা হয়।

মাদ্রজে পোস্টিঙের সময় তিনি সি রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কাজ করতেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে মহিলারা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত নয়। আন্নাকে জেলা সাব-কালেক্টারের পরিবর্তে সচিবালয়ে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

আন্না কর্মক্ষেত্রে নিজেকে তাঁর পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে সমকক্ষ মনে করতেন। একজন উজ্জ্বল ছাত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাইফেল, পিস্তল চালানো এবং ঘোড়া চালানোতে পারদর্শী ছিলেন। ম্যানেজমেন্ট দক্ষতাও তাঁর ছিল। ওই সময় ইন্দিরা গান্ধীর ছাড়াও এশিয়াড প্রকল্পে রাজীব গান্ধীর সঙ্গেও কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে হোসুর জেলায় সাব-কালেক্টার পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি প্রথম ভারতীয় নারী, যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ভারতের প্রথম জেএএস মহিলা আন্না রাজম একজন পরিশ্রমী এবং যোগ্য আধিকারিক ছিলেন। প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানে তাঁর ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর কার্যকালে হোসুর জেলার একটি গ্রামে ছয়টি হাতি প্রবেশ করেছিল। অন্য কোনো আধিকারিক হলে হয়তো তাদের গুলি করে মেরে ফেলতেন। তবে আন্নার চিন্তা পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, হাতির দল যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই যেন তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

আন্নার দৃপ্ত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের কাছে জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা এবং ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের মধ্যে ভারতের নির্বাহী পরিচালিত হওয়া। এছাড়া খাদ্য উৎপদনের ধরন বোঝার জন্য তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আটটি রাজ্যে ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি ভারত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। উপসচিব, চেয়ারপার্সন, কৃষি মন্ত্রণালয়, জাতীয় বীজ কর্পোরেশন, এছাড়া খরচ সরকারি সচিব, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি তাঁর ব্যাচমেট আরএন মালহোত্রার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৮৯ সালে পদ্মভূষণে ভূষিত হন। ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মাসে ৯১ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

আন্না রাজম মালহোত্রার জীবনে আমরা দেখি একজন মেধাবী ছাত্রীকে। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য। সারাজীবন তিনি নিজেকে সমর্পিত করেছেন দেশের সেবায়। তাঁর অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে অনেক মহিলা সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং আগামীদিনেও হবেন এমন আশা রাখি। □

পান ও সুপারি ত্যাগ করুন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, সুপারিতে রয়েছে ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান। আপনারা যাঁরা কাঁচা সুপারি খেয়ে থাকেন বা খেতে ভালোবাসেন, নিশ্চয়ই লক্ষ্য বা অনুভব করেছেন যে, কাঁচা সুপারি চিবোলে একটা আলাদা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারণ এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার সাইকোঅ্যাকটিভ অ্যালকালয়েড। তাছাড়া কাঁচা সুপারি চিবোতে শুরু করলে শরীরে ধীরে ধীরে গরম অনুভূত হয়, এমনকী ঘামেরও সৃষ্টি হয়। এছাড়া সুপারি খেলে সাধারণত তাৎক্ষণিক যেসব সমস্যা হয় সেগুলো হলো— হাইপারটেনশন বা উচ্চরক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, অ্যাজমা বেড়ে যাওয়া এবং নাড়ির স্পন্দন বা টেকিকার্ডিয়ার পরিমাণ বর্ধিত হয়ে অস্থিরতা বাড়া। শুধু তাই নয়, বেশি সময় ধরে নিয়মিত সুপারি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পরবর্তীতে ক্যানসারের পূর্বাবস্থা বা 'স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা' দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও এড়িয়ে দেওয়া যায় না। মূলত মুখের ক্যানসারের মধ্যে বেশিরভাগই স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা' দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও এড়িয়ে দেওয়া যায় না। মূলত মুখের ক্যানসারের মধ্যে বেশিরভাগই স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা ক্যানসারে আক্রান্ত হতে শোনা যায়।

অপরদিকে পানে রয়েছে টারফেনলস। এই টারফেনলসের জন্য পান খেলে জিহ্বা ও ঠোঁটে দাগ পড়ে যায়। আর পান সেবনের মাত্রা দীর্ঘমেয়াদি হলে দাঁতেও স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে যাওয়াও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পান তো শুধু শুধু খাওয়া হয় না, পানের সঙ্গে থাকতে হবে চুন। কিন্তু চুনে রয়েছে আলসার বা ঘা সৃষ্টি হওয়া উপাদান 'প্যারা অ্যামিনো ফেনল' তা জানেন কি? আর এই ধরনের আলসার থেকে মুখে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার চুনের সঙ্গে সুপারির বিক্রিয়া ভয়ংকর। এই বিক্রিয়াতে

'এরিকোলিন' নামে একটি নারকোটিক অ্যালক্যালয়েড উৎপন্ন হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই বিক্রিয়াকে 'এরিকোলিন প্যারাসিমপ্যাথেটিক' বলা হয়, যা স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফলে চোখের মণি সংকুচিত হয় এবং লালার পরিমাণও বেড়ে যায়। তাছাড়া পানের সঙ্গে বেশিরভাগ তামাকজাতীয় দ্রব্য যেমন তামাক পাতা, জর্দা ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের সাধারণ মানুষের চেয়ে ওরাল ক্যানসার রোগ হওয়ার পাঁচগুণ বেশি সম্ভাবনা থাকে। তাই মুখের ভেতর যদি কোনও অসুবিধা অনুভব কিংবা আলসার হয়, সেক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব পরিশেষে পান, সুপারি, চুন, তামাক সেবন থেকে বিরত থাকুন, সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘায়ু লাভ করুন। □

বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের দীর্ঘ অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও অর্থনীতির ভরাডুবি হয়েছে

শুধু শিল্প নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ভাবেও সর্বভারতীয় স্তরে পিছনের সারিতে চলে গেল পশ্চিমবঙ্গ। বিগত ৪৬ বছরের কুশাসনের ইতিহাসকে মুছে ফেলে শিল্পের হৃত গৌরব ফিরয়ে আনতে না পারলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

আনন্দ মোহন দাস

যে কোনো রাজ্যের শিল্পায়ন নির্ভর করে সেই রাজ্যের সরকারের শিল্পনীতি ও শিল্পবান্ধব পরিবেশের উপর। শিল্পবান্ধব পরিবেশের অর্থ হলো, শিল্পের উন্নয়নে পরিকাঠামোগত সুবিধা, শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার দ্বারা প্রশাসনিক সুবিধা, এক লপ্তে জমির ব্যবস্থা, বিভিন্ন কর ছাড়, অন্যান্য আর্থিক সুবিধা, কাঁচামালের জোগান এবং রাজ্যের কর্ম সংস্কৃতি। উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য দিক হলো, সেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা অবশ্যই ভালো থাকা। হিংসা ও সন্ত্রাসমুক্ত রাজ্য না হলে শিল্পপতিরা বিনোয়োগে উৎসাহ দেখান না। শিল্পক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও পছন্দ করেন না। কিন্তু ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট এবং ১২ বছরের তৃণমূলের দীর্ঘ অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাজ্যের শিল্প এখন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে এরাজ্যের শিল্পের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে এসেছে। আজকের এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকানো দরকার।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মধ্যগগনে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে দেশের শিল্পতালুকের ৩৪ শতাংশ শিল্প এই রাজ্যে বিরাজমান ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময় শিল্পে এক নম্বর স্থানে অবস্থান করতো। বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে আমাদের রাজ্যে কয়েকটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। যেমন দুর্গাপুর, আসানসোলে মূলত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (রেল ইঞ্জিন), হলদিয়া পোর্ট, হাওড়ায় এশিয়ার বৃহত্তম ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং লেদ মেশিনের কারখানা ইত্যাদি।

হুগলি নদীর দুই তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অনুসারী শিল্প ও জুটমিল ছিল। বর্তমানে কিছু অবশিষ্ট থাকলেও তা এখন বিভিন্ন কারণে ধুঁকছে। একসময় এশিয়ার বৃহত্তম হোসিয়ারি শিল্প এই রাজ্যে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বামপন্থীদের বদান্যতায় চীনারা দখল করে নেয়। দেশের মধ্যে এই শিল্পে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন ছিল এই রাজ্যে। টেক্সটাইল ও রেয়ন শিল্পেও দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের উৎপাদনও দেশের মধ্যে নজরকাড়া অবস্থায় ছিল। সর্বোৎকৃষ্ট দার্জিলিং চায়ের রপ্তানিতে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে ছিল। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই সময় এই ধরনের ছোটো বড়ো শিল্প এই রাজ্যে অধিকমাত্রায় ছিল। সেজন্য, বিহার, ওড়িশা, গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ-সহ অনেক রাজ্যের মানুষ জীবিকার সন্ধানে এই রাজ্যে কাজ করতে আসতো। কিন্তু আজ সেই চিত্র বদলে গেছে। আজকের আলোচনায়, তদানীন্তন বিখ্যাত কয়েকটি শিল্প কারখানার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

হুগলির সাহাগঞ্জের ডানলপ টায়ার কারখানা, এশিয়ার বৃহত্তম হিন্দমোটরে মোটরগাড়ির (অ্যামবাসাডার) কারখানা, ত্রিবেণীর কেসোরাম রেয়ন, ত্রিবেণী টিস্যু মিল, কল্যাণী স্পিনিং মিলস, কেসোরাম কটন মিলন, শ্রীদুর্গা কটন মিলস, গঙ্গার দুই পাড়ের জুটমিল, গেস্টকিন উলইয়মস (জিকেডব্লুউ), মেটাল বক্স, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার, অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন, ব্রেথওয়েটে কোং, ব্রান স্ট্যান্ডার্ড, জেসপ অ্যান্ড কোম্পনি, মার্টিনব্রান, টেকসম্যাকো প্রভৃতি। অধিকাংশ কোম্পানিই আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ হিন্দমোটরের গাড়ি কারখানা ও ডানলপের টায়ার কারখানা বন্ধের ফলে ২৯০০০ শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। বামপন্থী রাজনীতির যূপকাষ্ঠে এই রাজ্যের শিল্পকে বিসর্জন দিয়ে যুবক- যুবতীদের ভবিষ্যৎ ও অর্থনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

এই রাজ্যে বহু মানুষের রোজগার এই সমস্ত বন্ধ কারখানাগুলির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিল। অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকরাও এখানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আসতো। বামপন্থী আন্দোলনে শিল্পে তার বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে গেল। এখানকার শ্রমিকরা পেটের টানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিল। এক কথায় বলতে গেলে রোজগারের জন্য অন্যত্র পাড়ি দিয়ে তারা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে লাগলো। এই অপ্রিয় ঘটনার সূত্রপাত যে বামপন্থী শাসনে হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান পরিসংখ্যানে জানা গেছে প্রায় ৪৫ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় এই রাজ্যে শিল্পের এই করুণ অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী হলো সিপিএম তথা বামপন্থীদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি। ষাটের দশক থেকে বামপন্থীদের ধর্মঘট, বনধ্, মিছিল ও হিংসার পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অধঃপতন ঘটেছে এবং কর্ম সংস্কৃতি নষ্ট হয়েছে।

বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর রাজ্যের বামপন্থীদের হিংসাত্মক ও জঙ্গি আন্দোলনের রাজনীতিতে আইনশৃঙ্খলা চরম অবনতি হতে লাগলো। ১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি ও উপমুখ্যমন্ত্রী সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু। সরকারে থেকেও অজয় মুখার্জিকে নানাভাবে সিপিএম হেনস্থা শুরু করলো এবং নেপথ্যে তাদের গোপন কারনামা চালিয়ে গেল। ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অশোক কুমার নাইট অনুষ্ঠানে বহু মহিলাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই অনুষ্ঠানে হিংসায় বেশ কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। হিংসার নিন্দা না করে সিপিএম এই ঘটনাকে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সর্বহারার বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করল এবং অপরাধীদের মনোবল বাড়িয়ে দিল। এই রাজ্য বামপন্থীদের আসল চরিত্র ফাঁস হয়ে নারীদের প্রতি সিপিএমের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেল। এর ফলে অপরাধীরা উৎসাহিত হলো। তাদের মদতে নকশাল ও মাওবাদীদেরও ক্রমশ প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। সর্বত্র আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা গেল। বামপন্থীরা ঘোলাজলে মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে গেল। ধর্মঘট, বনধ্ ও হিসাত্মক আন্দোলনের নামে দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড চালাতে লাগল। সিপিএম আন্দোলনের নামে বিভিন্ন স্থানে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের খেপিয়ে তুলল। জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের ফলে রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি বদল হয়ে কাজ না করে টাকা উপার্জন করার মানসিকতা গড়ে উঠল।

রাইটার্স থেকে সার্কুলার জারি করে আদেশ জারি হলো শ্রমিক আন্দোলন ও বিক্ষোভ পুলিশ কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কমিউনিস্টরা স্ট্যালিনের কায়দায় সবকিছু বন্ধ করে সর্বহারার নেতৃত্ব দিতে শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে চারিদিকে হিংসার পরিবেশ গড়ে তুললো। শিল্পপতি মানেই শত্রু এই প্ররোচনায় আদিত্য বিড়লার মতো শিল্পপতিকে কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে রাইটার্স বিল্ডিঙের নাকের ডগায় জিপিও ও রিজার্ভ ব্যাংকের মাঝে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রায় উলঙ্গ করে তার ১৫নং ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ অফিসে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করল। পরিণামে আদিত্য বিড়লা পাততাড়ি গুটিয়ে পরদিনই মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন। এই ভয়ংকর পরিবেশ দেখে শিল্পপতিরা এই রাজ্য ত্যাগ করে দেশের অন্যত্র বিনোয়োগে মনস্থ করলেন। এই রাজ্যে শিল্পের সর্বনাশ শুরু করল। শিল্পের বিনিয়োগ থেকে এই রাজ্য বঞ্চিত হলো। অনেক শিল্পের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। সারা দেশে এই রাজ্য শিল্পে পিছনের সারিতে চলে গেল। বামপন্থী শাসনে পরবর্তীকালে এই রাজ্য শ্রমিক খেপিয়ে জুটমিলের ম্যানেজারকে পিটিয়ে মেরে ফেলার উদাহরণও স্থাপিত হলো।

সিপিএমের এই কারনামা দেখে ১৯৭২ সালে কংগ্রেস সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ক্ষমতায় ফিরে আইনশৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি করলেন কিন্তু তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জনগণের রোষানলে পড়লেন। তিনি দেশের বেশিরভাগ বিরোধী নেতাদের জেলে ভরলেন। সঙ্ঘ-সহ অনেক সংগঠনকে বেআইনি ভাবে নিষিদ্ধ করলেন। ফলে জনসমর্থন হারালেন। ১৯৭৭ সালে নির্বাচন ঘোষণার পর দেশে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসনের অবসানের জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সমস্ত বিরোধী দল (সিপিএম-সহ) সমঝোতা করে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করলেন এবং কেন্দ্রে জনতা পার্টির শাসন কায়েম হলো। কিন্তু ওই বছর জনতা পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতায় রাজি না হয়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট বিকল্প বিরোধী দলের অভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনে

জয়ী হয়ে এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ফিরে এল। এককভাবে ক্ষমতায় ফিরে কিছুদিন পর থেকে পুনরায় আরও বেশি মাত্রায় সংগঠিতভাবে হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হলো।

খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি-সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ এই রাজ্যে উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শিল্প বিরোধী ভাবমূর্তির জন্য শত চেষ্টাতেও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শিল্প আনতে বিদেশে গেলেও কোনো লাভ হলো না। ধীরে ধীরে ভ্রান্ত শিল্পনীতি, সর্বত্র দলবাজি ও জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের ফলে চালু শিল্পগুলি শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ক্রমশ বন্ধ হতে শুরু করলো। এদের আমলে ছোটো-বড়ো প্রায় ৫৬ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। অচিরেই শিল্পে বন্ধ্যাত্ব এসে গেল। বেকারত্ব ও হিংসা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। ১৯৭৯ সালে এদের শাসনকালে মরীচঝাপির নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশগুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে বেশ কিছু উদ্বাস্তুদের খুন করল এবং চরম অমানবিক নির্যাতনে এখন থেকে উদ্বাস্তুদের বিতাড়িত করল। ক্ষমতার দম্ভে বাঙ্গলায় চারিদিকে শাসকদলের গুন্ডামি ও অরাজকতা তীব্রতর হলো। দেশের সামনে এই রাজ্যের নেতিবাচক ও হিংসাত্মক ছবি ভেসে উঠলো। রাজ্য শিল্পের বারোটা বাজিয়ে এরা শিল্প ছেড়ে ভূমি সংস্কারের নামে গ্রামেগঞ্জে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষি-সহ জোতদারদের জমি দখল করে দলীয় রাজ কায়েম করতে তাদের উপর আরও বেশি অত্যাচার আরম্ভ করলো। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বলপূর্বক দখলীকৃত জমি বণ্টন করতে লাগলো। সর্বক্ষেত্রে দলবাজি ও দখলদারি রাজনীতি তীব্রতম হলো। তার ফলে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেতে শুরু হলো। শিল্পে উৎপাদন বন্ধে ও কৃষিতে উৎপাদন কমে যাওয়ায় রাজ্যের জিডিপি হ্রাস পেল এবং রাজ্যের আয়ের উৎস ধীরে ধীরে বন্ধ হতে লাগলো। রাজ্যের অর্থনীতি ক্রমশ খারাপ হতে লাগল।

রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থায় উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে মিথ্যা আওয়াজ তুলে তারা কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনে নামল। গরিব আরও বেশি গরিব হতে লাগলো। অনেক মানুষ অনাহারে দিন অতিবাহিত করল। ২০০৭ সালের ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের (এনএসএস) তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১২ শতাংশ পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর বামপন্থীদের শাসনে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সর্বভারতীয় স্তরে পিছনের সারিতে চলে গেল। শিল্পের কঙ্কালসার চেহারা সামনে এল। বিলম্বিত বোধোদয়ে ২০০৮ সালে তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের শিল্পবিরোধী ভাবমূর্তি মুছতে টাটাকে বুঝিয়ে সিঙ্গুরে চাষের জমিতে ন্যানো মোটর গাড়ির কারখানা চালু করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো। টাটা সিঙ্গুরে কাজ শুরু করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী আশায় বুক বাঁধলেন হয়তো এবার শিল্পবিরোধী তকমা ঘুচে গেল এবং বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সিপিএমের দেখানো পথে, কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন, বিক্ষোভ ও অনশন শুরু করে দিলেন। মমতা সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা করার প্রতিবাদে বিভিন্ন ভাবে রাজ্যের জনগণকে খেপিয়ে তুলে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর খেলায় মেতে উঠে সিপিএমের বিরুদ্ধে কৃষকবিরোধী তকমা এঁটে দিলেন।

এই আন্দোলনের ফলে কয়েকশো কোটি টাকা ক্ষতি করে টাটা রাতারাতি পাততাড়ি গুটিয়ে গুজরাটে ন্যানো গাড়ির কারখানা খুলতে মনস্থ করে ফেললেন। টাটার মতো সংস্থার অপ্রীতিকর অবস্থা দেখে দেশের শিল্পপতিরা রাজ্যের নেতিবাচক দিকটি আবার উপলব্ধি করলেন। দেশের শিল্পপতিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় শিল্পবিরোধী রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হলো। মমতা এই আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকারকে অপসারণ করতে ডাক দিলেন। রাজ্যের জনগণ অত্যাচারী বামফ্রন্ট শাসনে তিতিবিরক্ত হয়ে পরিত্রাণের আশায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে বিদায় দিলেন। জণগণ বামপন্থীদের ৩৪ বছরের অপশাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে অনেক আশা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলকে ক্ষমতায় নিয়ে এলেন।

কিন্তু কোনরকম পরিবর্তন না হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই জনগণের মোহভঙ্গ হলো। সেই বামেদের একই ট্রাডিশন তৃণমূলের শাসনকালে আরও বৃদ্ধি পেল। বরং বর্তমান শাসক বামপন্থী কারনামাকে আরও বেশি রপ্ত করে রাজ্যে আরও বেশি হিংসা ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিল। সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দখলদারির নামে সর্বত্র ধর্ষণ, খুনোখুনি, বোমাবাজি, দলবাজি, সিন্ডিকেট, কাটমানি ও শিক্ষা-সহ সর্বত্র দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হলো। দুর্নীতির অভিযোগে শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী ও কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। আদালতের নির্দেশে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই, ইডির মাধ্যমে চলছে। সমস্ত দিক থেকে শাসকদল দুর্নীতির জালে জড়িয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির ফলে সারা দেশে রাজ্যের ভাবমূর্তি তুলনামূলক ভাবে আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল। এ রাজ্যের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি দেখে কোনো শিল্পপতি বিনিয়োগ করলেন না। মমতা শিল্প স্থাপনে দেশ বিদেশে সরকারি খরচে ভ্রমণ করে অনেক মউ স্বাক্ষর করলেন বটে কিন্তু দীর্ঘ ১২ বছরে কোনো শিল্পপতি এ রাজ্যের শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এলেন না। বরং বেশ কিছু শিল্প বন্ধ হয়ে গেল এবং বামপন্থী অপশাসনের প্রতিফলন ঘটল।

মমতা বুনিয়াদি উন্নয়নের পথে না গিয়ে রাজত্ব কায়েম রাখতে ভোটের স্বার্থে ডোলের রাজনীতি শুরু করে দিলেন এবং মানুষকে কর্মবিমুখ করে তুললেন। তিনি জনগণের পরিত্রাণের ব্যবস্থা না করে ত্রাণের রাজনীতি আরম্ভ করলেন। শিল্পবিহীন রাজ্যে বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে না পেরে বাঙ্গালিরা অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে গেলেন। মমতা আয়ের উৎস সৃষ্টি না করে ক্ষমতা কায়েম রাখতে মেলা, খেলা, উৎসবে ও পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে প্রাধান্য দিলেন। 'বাংলা নাকি সব কিছুতে এগিয়ে' এমন চটকদারি মিথ্যা স্লোগানে ভরিয়ে দিলেন। তিনি বামফ্রন্টন্টের ১৮৬০০০ কোটি টাকার ঋণকে ৬১১০০০ কোটি টাকায় পৌঁছে দিলেন। রাজ্যের মানুষের মাথায় বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে এবং শিল্পের কবর খুঁড়ে সব দিক থেকে বামফ্রন্টের অপশাসনকেও ছাপিয়ে গেলেন। বামফ্রন্টের মতো নিজের অক্ষমতা ঢাকতে, কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করে জনগণকে খেপিয়ে দিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে আজ সব দিক থেকে পিছিয়ে গেল। অস্বীকার করার উপায় নেই এ রাজ্য শুধু শিল্প নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ভাবেও সর্বভারতীয় স্তরে পিছনের সারিতে চলে গেল। এই পরিস্থিতিতে এ রাজ্যের ভাবমূর্তি ফেরাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই ধরনের ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে তৃতীয় বিকল্প শক্তির উত্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে, নেতিবাচক রাজনীতির অতল গভীরে এ রাজ্য আরও তলিয়ে যাবে। বিগত ৪৬ বছরের কুশাসনের ইতিহাসকে মুছে ফেলে শিল্পের হৃত গৌরব ফিরয়ে আনতে না পারলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। ■

বাম তৃণমূল মিলে রাজ্যের শিল্প নির্মূল করেছে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিপর্যয়ের ডাইরি খুলে একটু দেখি। সবাই বলছে তৃণমূল ছারখার করে দিল এ রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে। কিন্তু যখন ১৯৬২ সাল অর্থাৎ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রয়াণের থেকে রাজ্যে শিল্প ডাইরি ঘাঁটছি, অনেক আপাত ফিকে স্মৃতির সরণি ধরে ধরে পৌঁছালাম বর্তমান সময়ে। তখন মনে হলো, তৃণমূল এই রাজ্যে শিল্পের খরা ডেকে এনেছে। বিনিযোগ কী, সে শব্দের সঙ্গে ২০১১-র পর থেকে এরাজ্য আর পরিচিত হয়নি। সবাইই সহমত। এই খরার সত্য এবং কম-বেশি তথ্য সবাই রাখি। একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র পাশ করার অগেই জানেন তাঁর কর্মস্থান আর পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। খরার আগেও যে এরাজ্যে শিল্প ধ্বংসের সুনামি এসেছিল। তার কেন চর্চা হবে না! বরং তার চর্চাই বেশি হওয়া উচিত। পঞ্চায়েতের হাওয়া আসতেই বামপন্থীদের বলতে শোনা যাচ্ছে— ওরা নাকি কর্মসংস্থান এবং সম্ভানার দ্বার খুলবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের ইতিহাস যে এক্কেবারে উলটো ট্রাক রেকর্ড দেখিয়েছিল। হ্যাঁ, বাম আমলে এই বাঙ্গালিদের কেরানির চাকরি সত্যিই ছিল। চাকরি চুরিও তৃণমূলের মতো এমন নির্লজ্জতার সঙ্গে হতো না। কিন্তু আর তো কোনো উপায়ও ছিল না বাঙ্গালির। শিক্ষিত বাঙ্গালির সঙ্গে ব্যবসার সহাবস্থান অনেক চেষ্টা করেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তেমন জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্য করতে পারেননি।

বাকি রইল শিল্প। কিন্তু শিল্পপতিরা কি মানুষ? তাঁরা কি ভদ্রলোক? তাঁরা কি কর্মসংস্থানের বিপুলতা আনেন? আজকে যতই উলটো সুরের তান বাজাক, কিন্তু সেই যে সেদিন যেদিন আদিত্য বিড়লাকে রাইটার্স বিল্ডিঙের সামনে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় কমরেডরা লাঞ্ছিত করেছিল, সেদিন তো কমরেডরা শিল্পপতিদের শ্রেণীশত্রু বলত। ভদ্রলোক বাঙ্গালি মানে সেদিন লালসেলাম করা misused intellectuals এবং বিনিয়োগের সমর্থনকারী মানেই তিনি বুর্জোয়া। তিনি শ্রেণীশত্রু। কমিউনিস্টরা ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার অনেক আগেই তাদের শিল্পবিরোধী আচরণ প্রদর্শন করেছিল। সিনেমার সংলাপেও তার গভীর প্রভাব। সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী সিনেমা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-তে সিদ্ধার্থ চরিত্র যখন টো টো করে চাকরি খুঁজছে, ইন্টারভিউতে তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের আবেশ উন্মাদনা স্পষ্ট। সে টেকনোলজির প্রশংসা করে না। করে মানুষের সাহসের। না সিদ্ধার্থ ভুল বলেননি। মানুষের সাহস না থাকলে পরিবর্তন আসে না। পৃথিবীর ইতিহাস তাই-ই বলেছে বারবার। কিন্তু সময়োযোগী হতে হলে টেকনোলজিকে বুর্জোয়া ভাবাটাও একরকম গোঁড়ামি। সিদ্ধার্থ নিজেকে বামপন্থী বলে স্বীকার করেনি। সিদ্ধার্থ সেই ব্রেন ওয়াশড বাঙ্গালির প্রতীক প্রতিনিধি যারা গ্লোবালাইজেশন ও প্রাইভেটাইজেশন শুনলেই চেঁচিয়ে বলত– আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম।

যখন এমন সব সিদ্ধার্থদের ভিড় পথেঘাটে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, তখন কলকাতাতে ইউরোপিয়ান বিনিয়োগকারীরা তল্পিতল্পা গোটাচ্ছেন। মাঝে মাঝে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন (সেটাও বাম আমলে মুখ থুবড়ে পড়ে) কিংবা ফারপো'স-এ রোস্টেড ল্যাম্ব খেতেই দেখা যাচ্ছে, তখন মাড়োয়ারি শিল্পপতিরা জাঁকিয়ে বসছে কলকাতায়। কলকাতার রাজপথ বামপন্থীদের (সিপিআইএম এবং নকশাল) শিল্পবিদ্বেষী রূপ সেদিন থেকে দেখেছে– ১৯৬৮-র ১২ জানুয়ারি যেদিন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যানের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের এক্সিকিউটিভ নীলকান্ত রত্নাকর ডোংগেকে ঘেরাও। তাকে বাধ্য করে ব্যবসা গোটাতে। আঘাত করেছে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ড্রাস্টিকে। বামপন্থীদের তাণ্ডবে আর ইউনিয়নবাজিতে হেরে গিয়েছিল Jassop & Company, Braithwaite, Burn & Company, Indian Standard Wagon, GKW (The Guest Keen Williams), Metal Box, এমনকী বাদ যায়নি Aluminium Corporetion—যা একদিন এই রাজ্যের গর্ব ছিল। যা ছিল ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক সংস্থা। যে লক্ষ্মীপত সিংহানিয়া ১৯৪২-এ কানপুর ছেড়ে কলকাতায় ব্যবসা শিল্প গড়ে তোলেন, বামপন্থীদের অত্যাচারে তাঁকেও ১৯৭০ সালে নিজের পুত্র হরিশঙ্করকে নির্দেশ দিতে হয়েছিল কলকাতায় আর নয়। শিল্প চলে গেল দিল্লিতে। এবং ১৯৭৪ সালে ন্যাশনালাইজডও হলো। এ কেবল এক সিংহানিয়ার কলকাতা থেকে পালানোর গল্প নয়। সেই পথে হাঁটতে বাধ্য হন ১৯৭৮ সালে বসন্ত কুমার বিড়লার পুত্র আদিত্য বিক্রম। চলে গেলেন বোম্বেতে। ১৯৮০ সালে এস কে বিড়লাপুত্র সিদ্ধার্থও মানে মানে পালিয়ে গেলেন দিল্লিতে। ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট বামপন্থীদের চাইতে ভালো আর কেউ জানে না। এবং সেই ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট মানে কারখানা বন্ধ, ঘেরাও, ইউনিয়ন দখল। লকআউট এবং বামপন্থীদের ট্রেড ইউনিয়ন আসলে সমার্থক।

বামপন্থীদের ইতিহাসের দলিল কি অস্বীকার করতে পারবে আর এন মুখার্জি রোডের ১৬ তলা বিড়লা হাউস, যা ছিল বিড়লা কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ দপ্তর, তাকে ১৯৭০-এর পর থেকেই বাম ইউনিয়ন জবরদখল করতে উঠেপড়ে লাগল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জ্যোতি বসুর কাছে হাজার আর্জি করেছিল বিড়লা কোম্পানি। কিন্তু সবটাই পরিহাস। শ্রেণীশত্রুদের পাত্তাই দেননি কমরেড বসু। একটা বড়ো সময় বিড়লাদের অফিস বন্ধ রেখে বাড়ি থেকে নথিপত্রের কাজ করতে হতো।

তারপর পিভি নরসিংহ রাও যখন মুক্ত অর্থনীতির পথ প্রশস্ত করলেন, বিশ্ব দেখল ওসব সোশ্যালিস্ট মডেলের কী নিদারুণ পরিণতি। পরিণতির সেরা উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। তখনও এরাজ্যের টগবগে বাম শাসন Brooke Bond India থেকে ICI India, Swah Wallace, Bata এমনকী ইলেক্ট্রনিকস দুনিয়ার এক ও অদ্বিতীয় নাম ফিলিপস ইন্ডিয়াকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কলকাতা থেকে বহিস্কার করেছে। কমরেডদের কাঁঠালের আমসত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক

> **পশ্চিমবঙ্গের বুকে বামপন্থীরা বিভ্রান্তপন্থীও বটে। যারা শিল্পের বিষয়ে যাই ভেবেছে তা সফল হওয়া তো দূরস্থ বরং সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরে ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিপন্ন। অবলম্বিত শিল্প তৎপরতা তাদেরই নিষেধাজ্ঞায় বিপ্লবাত্মক মোড়ে মুচড়ে পড়েছে।**

বাজারের অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের পেরেস্ত্রৈইকার ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেনি। সারা বিশ্ব মুক্ত অর্থনীতির পথে একছন্দে হাঁটছে, এমনকী ভারতের অন্যান্য রাজ্যও তাল দিচ্ছে, তখন এরাজ্যে বাম বিপ্লবে কারখানা বন্ধের প্রতিযোগিতা এবং CITU-র অনুপ্রেরণায় ১৯৯৬-তে অপারেশন সানসাইনের নাম দিয়ে বিকল্প ব্যতিরেকেই হকার উচ্ছেদের শক্তি প্রদর্শন। পূর্ব ভারতের জীবনদায়ী ওষুধ পেনিসিলিন উৎপাদনকারী একমাত্র সংস্থা শ্রীরামপুরের কারখানা স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ওপেক ইউনাইটেড ৩০ মে ১৯৯১-এ বন্ধ হলো। টানা চার বছর বন্ধ ছিল। তারপর ১৯৯৪ থেকে চলেছে কারখানা খোলার দাবি। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি তখনও ভাষণে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের তীব্র নিন্দায় ব্যস্ত। দাবি শোনার সময় ছিল না। শ্রমিক সংগঠন মানেই যেন উৎপাদনহীন লালঝান্ডার অতি বিপ্লব— এমনটাই শেখাল পশ্চিমবঙ্গের বামেরা। লালঝান্ডার দোলা যে যে কারখানার সামনে এসেছে সেটাই ট্রেনের সিগনালের মতো কাজ করেছে। বন্ধ হয়েছে কারখানা। দুটো সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গের বাম ইউনিয়ন কতটা শিল্পবিরূপ ছিল। ১৯৯৪-তে যখন ঐতিহ্যশালী হেস্টিংস জুট মিল বন্ধ হব হব করছে, সম্ভাবনাপূর্ণ সেই কোন স্বদেশিযুগের তৈরি ন্যাশনাল ট্যানারি ধুঁকছে; কারখানা চালানোর উদ্যোগ না নিয়েই বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের ভালোমানুষ সাজাতে কারখানা নিল কিনে। ঠিক তখনই বিপরীত চিত্র বোম্বের কামানি গোষ্ঠীর। তাদের শ্রমিক সমবায় BIFR-এ ৫১১.১৪ লক্ষ টাকার এক পুনরুজ্জীবন প্রকল্প জমা দিয়ে তার অনুমোদন আদায় করেই ছাড়ল। তারা আধুনিকীকরণ করল। দম নিয়ে বলেছিল, আমরা লাভের মুখ দেখবোই। কাজ শুরুর দু'মাসের মধ্যেই তারা ১৫০ টনের অর্ডার সংগ্রহ করেন। তখন বেলেঘাটায় রাসমণি বাজারে 'বাঁচাও কমিটি' টিম টিম করে রাজ্য সরকারের শিল্প অবক্ষণের সমালোচনা করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বেতন না পাওয়া শ্রমিকরা আদালতে আর্জি করছেন যদি সরকার কারখানা চালাতে না পারে তবে শ্রমিকরা যেন কো-অপারেটিভ গঠনের অনুমতি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রীয় শেয়ার ছিল যথাক্রমে ২৪ ও ২৭ শতাংশ। তা কমরেডদের তাড়া খেয়ে ২০০৭-৮ সালে হলো যথাক্রমে ৩.৯০ এবং ৪.৯০ শতাংশ। ১৯৯১-২০০৩-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের letters of intent (শিল্প) যখন ৪, ৫৪২ এবং প্রপোসড ইনভেস্টমেন্ট ২,৯, ২৫,৩২০। টাকা তখন ওই খাতে গুজরাটের অঙ্ক ৯,৩৬০ এবং ৭,২৪৭, ৪৪০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের চাইতে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ সবাই তখন উল্লিখিত দুটি প্যারামিটারে অনেক এগিয়ে। ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় অবস্থান ছিল ৮ম স্থানে। যা বামেরা আসতেই ৯ম স্থানে নেমে এল। তারপর নামতে নামতে ১৯৯০-৯১-এ সবার শেষে; কেবলমাত্র অসমের ওপরে। ২০০৯-এ যখন কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর শ্রমদিবস নষ্টের তথ্য প্রকাশ করেছে, ওই একটা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের ধারে-কাছে কোনো রাজ্য আসতে পারেনি। একবছরে ৬, ৮৩৫,০০০ মানব/শ্রম (man days) সারা দেশে নষ্ট। তারমধ্যে একা পশ্চিমবঙ্গের ঘরেই ৫,৮৫৪,০০০। এই তথ্য বলে দেয় কমরেডদের শ্রম ও শ্রমিকের উন্নতির নামে তঞ্চকতার বহর। ১৯৮০-৮১ থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প দ্রুত অবনতির দিকে হাঁটতে শুরু করল। গ্রোথ রেট ৯.৮ শতাংশ থেকে কমতে থাকল যা ১৯৯৫-৯৬-তে ৫.১ শতাংশ এবং তারপর ক্রমশ কমতির দিকে। এবং আর তার বৃদ্ধি একদিনের জন্যও হয়নি। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা এ রাজ্যে ১৯৮৪-২০০১-এর মধ্যেই ৫০ শতাংশ কমে। সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রে ১৯৮০-তে যখন কর্মী সংখ্যা ছিল ১০,৮৪ লক্ষ, তা ১৯৯৭ সালে দাঁড়াল ৭,৯৯ লক্ষে। এর পরেও বামেরা বুক চিতিয়ে বলে তারা শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু। তারা শ্রমিকের স্বার্থে লড়াই করে। হাস্যকর এর উত্তর ১৯৮৬ সালের চেম্বার অব কমার্সের এক অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসু দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,'due to modernization, tears would swell in many eyes.' তবু বলেননি তাঁরা ভুল করছেন। বিধান রায়ের পশ্চিমবঙ্গকে ওরা পলিটিক্যালিটি এক্সপ্লয়েট করেছেন। তৃণমূল সেই মাটিতে খেলা হবে বলে নাচছে। আজকের বামেরা দেখেছে ১৯৯১-র Stastesman-এর সেই পেপারকাট? 'Labour in Red regime'. অদিতি রায় ঘটকের ওই নিবন্ধে উল্লেখ ছিল ১৯৮৩-৯০-এব মধ্যে যখন বাম বিপ্লবে ১৯টি বড়ো শিল্প কারখানা বন্ধ হলো তখন ৯৮২ জন শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু ঘটে। এই ছিল বামপন্থীদের শ্রমিক দরদি মুখোশ।

জ্যোতি বসুর আমলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল— তারা জমি ও ভেড়ি অধিগ্রহণ করতে পারবেন। আমাদের পোড়াকপাল যে ভেড়ি ভরাট করে শিল্প হয়নি। প্রমোটিঙের পথ দেখাল সিপিআইএম। ২০০৮ সালের ২৯ আগস্ট শান্তনু সেনগুপ্ত 'A History of the Brutal Rajarhat Land Aquisition, Bengal's New IT hub' শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছেন রাজারহাটের জমি অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষি সম্ভাবনাময়। তিনি বলেছেন, ‘‘" According to the documents of the land revenue department the number of recorded landowners was over 30,000 while 5000 were recorded bargadars... the land mafia started buying up the land from the poor farmars."

পশ্চিমবঙ্গের জমি অধিগ্রহণ নীতির সংস্কার করেনি বামেরা। যার ফল ভোগ করতে হয়েছে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে। সিঙ্গুরের টাটা কারখানায় জমি অধিগ্রহণ নীতি নিয়ে বিতর্ক আছেই। সেই বিতর্কের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ৯০ শতাংশ তৈরি হয়ে যাওয়া টাটা কারখানা যা এ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের জীবিকার নতুন দিশা দেখাতে পারত, উৎপাদনের সূর্যোদয় হতে পারত, তার আগাপাস্তালা ধূলিসাৎ ঘটাল মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক অস্থিরতা। তিনি যে পদ্ধতিতে টাটাগোষ্ঠীকে এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তা শিল্পপতিদের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেই সিঙ্গুর আন্দোলনকে হাতিয়ার করে মমতা

ফ ঃ ৪

ব্যানার্জির তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এলেও বিনিয়োগকারীদের বিচারে তিনি হয়ে উঠলেন এক বিভীষিকা। তৃণমূল আমলে বোমাশিল্প রাজ্যে চনমন করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ক্লাব কালচারে মেলা-খেলা-মোচ্ছব করছেন। কিন্তু এযাবৎ একটাও কারখানার ফিতে কাটেননি। মাদার ডেয়ারির শেয়ার বিক্রি হয়েছে, আইএফএ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে তালা পড়েছে। জ্যোতি বসুর আমলে তৈরি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের আর্থিক ক্ষতির অঙ্ক ১৬৭ কোটি! হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রি বেল্টে শেষ দুবছরে বন্ধ হলো Ennore Coke Ltd, Robit Ferro-tech Ltd, Modern Casting Pvt Ltd, JVL Agro, Kenoria Foundatoin-র মতো সংস্থা, কম করে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিক কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, পুরুলিয়ায় বাম আমলে ৩,৪৫১ একর জমি চিহ্নিত করা ছিল শিল্প হবে বলে। সেখানে তৃণমূল আমলে Balaji Industry, Reliance Cement, Emami, Shyam Steel এরকম অনেকেই বিনিয়োগের আগ্রহ দেখানো সত্ত্বেও রাজ্য অনুমতি দেয়নি। West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation সব অনুমতিতেই কিছু না কিছু নাকচ এনেছে। তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চার বছরের মধ্যেই ৩৮ হাজার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। এ তো open secret যে এ রাজ্য তোলাবাজের অভয়ারণ্য। তাই কে বিনিয়োগের সাহস করবে? আইএফএ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ২০২০-র জুন মাসে গুন্ডার দল নূরপুর ইউনিটে ভাঙচুর করে। গান পয়েন্টে রেখে ফ্যাক্টরি ফাঁকা করার হুমকি আসে। এই দৃশ্যের পরেও এখানে থাকবে বিনিয়োগের আশা? প্রতি বছর গ্লোবাল বিজনেস সামিটে যে ব্যয় হয় সেই পরিমাণ বিনিয়োগটাও এ রাজ্যে আসে কিনা সন্দেহ। ২০২২ বিজনেস সামিটে ১৩৭টি মেমরান্ডাম অব অনডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর হয় এবং ৩.৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাবনা আসে। তারপর আর একটা সংবাদ শিরোনাম হয় না— নতুন বিনিয়োগ এল। কিন্তু আবার পরের বারের গ্লোবাল সামিট এবং অর্থ অপচয় চলবে। এ হাস্যকর বেদনার ছবি এখন কে জানে না!

১৯৬০ সালে বাঙ্গলার পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল মহারাষ্ট্রের ১০৫ শতাংশ তা আজ মহারাষ্ট্রের অর্ধেক। স্বাধীনতার সময় শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল শেয়ার ছিল ৩০ শতাংশ তা আজ ৩.৫ শতাংশ! ২০১০-১১-তে পশ্চিমবঙ্গের ঋণ এবং গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের অনুপাত ছিল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। তারপরেও ২০১২-তে মমতা ব্যানার্জি Walmart-কে বিনিয়োগের পথ দিল না। এখন জ্যোতিবাবুদের ফেলে রাখা 'শালবনি জিন্দল গোষ্ঠী'র জমিতে শিল্প গড়ার বার্তা দিলেন মমতা ব্যানার্জি। শিল্পতো উদ্দেশ্য নয়, রাজনৈতিক 'নবজোয়ার কর্মসূচি' এ ভাষণ মাত্র। বাম আমলের ৪,৩০০ একর জমির মাত্র ১৩৫ একরে সিমেন্ট কারখানা তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়েছে জিন্দল গোষ্ঠী। এখনও পর্যন্ত বিনিয়োগে শিল্প উৎপাদনের শেয়ারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দেশের রাজ্য ভিত্তিক অবস্থানে তলানিতে। কর্ণাটকে যখন SEZ (Special Economic Zone) ৬২টি, মহারাষ্টে ৩৮, তামিলনাড়ুতে ৫৪, তেলেঙ্গানায় ৬৮, উত্তরপ্রদেশে ২৩টি তখন পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা ৭টি! সদ্য জাপান রাষ্ট্রপ্রধান যখন ভারত সরকারের সঙ্গে সাক্ষাতে ৩,২০, ০০০ কোটি টাকার মেমরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন করেন যেখানে গুজরাত কর্ণাটক মধ্যপ্রদেশ-সহ সব রাজ্য উপস্থিত ছিল; যথারীতি ছিল না কেবল মোচ্ছব প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

যখন অন্য রাজ্যে অ্যাপেল কিংবা টেসলা বিনিয়োগের জন্য জমি চিহ্নিত করেছে তখন আমাদের রাজ্যের এক সময়ের অহঙ্কার ডানলপ কারখানাটাও নিলাম হয়। যা ছিল দেশের প্রথম টায়ার কারখানা। ডানলপের অস্তিত্ব আর থাকল না আমাদের দেশে। আমাদের রাজ্যের প্রতিটা ঐতিহ্য অসম্মানিত বাম এবং তৃণমূলের হাতে। বাদ যায়নি ডাকব্যাগটাও। প্রফুল্ল রায়ের হাতে যার উদ্বোধন। তাঁর স্নেহধন্য সৌমেন্দ্র মোহন বসু যার সূচনা করেছিলেন। সেই রাবার শিল্প কারখানার প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত হয় বাম আমলে। ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মমতা ব্যানার্জির প্রতিশ্রুতি ছিল তারা ক্ষমতায় এলে শিল্পের জমিতে শিল্পই হবে। তারপর সব হলো, ক্ষমতা বদল হলো। কিন্তু কারখানা আর খুলল না। তলিয়ে গেল অন্ধকারে। মমতার শাসনে বাম আমলের মৃতপ্রায় শিল্পগুলি পূর্ণমৃত হয়েছে। তৃণমূল আসার প্রথম ১০ বছরে ব্যারাকপুর অনলাইন মোট ১৭৪টি কারখানায় তালা পড়েছে। এবং শেষ পাঁচ বছরে (২০১৬-২১) এর মধ্যে মোট ২১,৫২১টি ফ্যাক্টরিতে চাকা ঘোরেনি। যার মধ্যে ২৭১টি বড়ো শিল্প। রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজ্যেকে বিনিয়োগের সঙ্গে আড়ি দেখিয়েছে। তৃণমূল যে আদ্যপ্রান্ত একটা বিশৃঙ্খল লণ্ডভণ্ড আপাদমস্তক অর্থলোভী এবং সার্বিক উন্নয়ন পরিপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন তা স্পষ্ট। তা বোঝার জন্য তেমন একটা রাজনৈতিক জ্ঞান লাগে না।

কিন্তু বামেদের যে সূক্ষ্ম শিল্প বিরোধিতা যা বিপ্লবের আড়ালে মরচে ধরিয়েছে মেশিনে যন্ত্রে— তা সত্যিই অনুসন্ধানের রসদ বটে। ওরা শিল্প শব্দের বার বার বিরোধিতাই করেনি পরস্পর বিরোধীও হয়েছে। সোমনাথ চ্যাটার্জির কথা না বললে নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৯৪, যখন তিনি West Bengal Industrial Development Corporation-এর চেয়ারম্যান, তখন তিনি প্রাইভেট ক্যাপিটালাইজেশনের প্রতি সমর্থন জানান। তারপরই যত বিবাদ ১৫তম পার্টি কংগ্রেসে রেজুলুশান ছিল 'Care should be taken to see that our government...(does) not...justify the libaralisation policies...(our) policies should be in defence of the public sector...and this should be the basis for our Party's propaganda and mobilizatoon' ব্যাস, এই ছিল কমরেডদের পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সম্ভাবনার বুকে শেষ পেরেক। তারপরেও তারা SEZ (Special Economic Zone)-এ বিদেশি বিনিয়োগ বিষয়ে দ্বিচারিতা করতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হননি। যারা ইউপিএ আমলে বলছে 'In a revenue loss of Rs. 1,75,487 cr against an estimated investment of 3,60,000 cr. The justifiability of the tax charges to big business under the SEZ policy needs to be thoroughly debated'— তারাই আবার ২০০৭ এ যখন 'Doing Business in West Bengal' রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করল তখন তাদেরই পূর্বের SEZ নিন্দা সমালোচনা রূপান্তরিত হলো আমন্ত্রণ উৎসাহে। তাই পশ্চিমবঙ্গের বুকে বামপন্থীরা বিভ্রান্তপন্থীও বটে। যারা শিল্পের বিষয়ে যাই ভেবেছে তা সফল হওয়া তো দূরস্থ বরং সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরে ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিপন্ন। অবলম্বিত শিল্প তৎপরতা তাদেরই নিষেধাজ্ঞায় বিপ্লবাত্মক মোড়ে মুচড়ে পড়েছে। ■

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে রানি রাসমণি রোডে বিশ্ব যোগ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে কলকাতার রাড়ি রাসমণি রোডে প্রতি বছরের মতো এবারও যোগ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার হাজার যোগপ্রেমী মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, জৈন মুনি জীনেশ কুমারজী, বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভার সাধারণ সম্পাদক ড. উদয় সরকার, ক্রীড়া ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি তথা ভারতীয় কবাডি দলের পূর্বতন অধিনায়ক ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত, ক্রীড়া ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি তথা বিশিষ্ট পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী অজয় নন্দী এবং ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় সহ সাধারণ সম্পাদক মধুময় নাথ।

যোগানুশীলন-সহ সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট যোগ শিক্ষক ড. অভিজিৎ ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ক্রীড়া ভারতী কলকাতা মহানগরের সম্পাদর সঞ্জয় মণ্ডল।

বীরনগর জয়পুরে সমরসতার রথযাত্রা

রথযাত্রা হলো সমরসতা ও সংগঠনের উৎসব। পরস্পরের অপরিচিত কোটি কোটি মানুষ একত্রিত হয়ে একই লক্ষ্য, একই উপলক্ষ্যে চালিত হন। সকলেরই উদ্দেশ্য প্রাণপ্রিয় জগন্নাথের রথকে তার গন্তব্যে পৌঁছানো। পাশের যে মানুষটি রথের দড়ি ধরে টানছেন তার জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নন কেউ। পুরীধামের রথযাত্রা অনুসরণে মূলত পূর্ব ও পূর্বোত্তর ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে রথযাত্রা আচরিত হয়ে চলেছে। বিশেষ করে বঙ্গদেশে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ঘরে ঘরে পালিত হয় উৎসব। এই বছর 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির' নামক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে নদীয়া জেলার সীমান্ত বীরনগর জয়পুর গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সামুহিক রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। রথযাত্রার দিন সারাদিন ধরে বিশেষ পূজা এবং বিকেলে রথযাত্রার পরও বিগত নয়দিন ধরে গ্রামবাসীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। উলটো রথের দিনও তার কোনো ব্যত্যয় চোখে পড়েনি। রথযাত্রা প্রসঙ্গে 'দেশের মাটি' গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, রথযাত্রার মাধ্যমে সমাজ চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, অধ্যাত্ম চেতনা এবং সর্বোপরি হিন্দু সমাজে সমরসতা ও একাত্মতার জাগরণ ছিল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা এই উদ্দেশ্য পূরণে সম্পূর্ণ সফল।

শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সেবা সম্মান সমারোহ

'এই শতাব্দী ভারতের শতাব্দী। ভারত কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়। এদেশের সার্বভৌমত্ব জনসাধারণের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা 'আমরা ভারত' এই সম্বোধনে দিয়েই শুরু হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এদেশের মানুষকে সদাসর্বদা সেবার প্রেরণা দেয়। সেবার মধ্যেই প্রগতিশীল ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব।' —গত ২৫ জুন শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত ৩৭তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান সমারোহে সভাপতির ভাষণে এই কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে এবারের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রদান করা হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম রাজ্যের কার্বি আংলং জেলার সেবাভাবী সংগঠন 'লখীমন সঙ্ঘ'-কে। মহামহিম রাজ্যপাল সম্মানস্বরূপ সংগঠনের প্রতিনিধির হাতে একলক্ষ টাকার চেক এবং মানপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে স্বামী কীর্তিপ্রদানন্দ মহারাজ, বিশেষ অতিথি রূপে সজ্জন কুমার তুলসীয়ান এবং প্রধান বক্তা রূপে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা অতুল রামচন্দ্র জোগ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র একক গীত পরিবেশন করেন। শ্রীযোগেশরাজ উপাধ্যায়ের কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সীমা রস্তোগী, শকুন্তলা বাগড়ী,বংশীধর শর্মা, সজ্জনকুমার তুলসীয়ান, স্বামী কীর্তিপ্রদানন্দ মহারাজ এবং মহামহিম রাজ্যপাল লখীমন সঙ্ঘের বলরাম ফাংগচো-কে সম্মান প্রদর্শন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমারসভা পুস্তকালয়ে অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. তারা দূগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের পূর্বতন অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অফ কালচারে বিশ্ব যোগ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অফ কালচার এবং আরোগ্য ভারতী কলকাতা শাখার যৌথ উদ্যোগে বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এক যোগ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়। প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ঋষি প্রণীত যোগের ৬৪ ধারার ১৭নং যোগাসন অভ্যাস এবং দ্বিতীয় ভাগে আরোগ্য ভারতী কলকাতা শাখার যোগাসন অভ্যাস হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী সন্তদাস যৌগিক কলেজের শিক্ষক তথা আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের যোগ প্রশিক্ষণ প্রমুখ রণদীপ বোস ।অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ঋষি প্রণীত যোগ, তার কার্যধারা ওঙ্কার শব্দের পড়া,পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখড়ী। স্থূল শরীরে শব্দের স্থূল ধ্বনি থেকে সূক্ষ্মধ্বনি, তার পরিমাণ ১১০০।আবার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ— এই তিন শরীরে ধ্বনি ৩ × ১১০০ = ৩৩০০ জাগ্রত করে স্থূল চেতনা থেকে সূক্ষ্ম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। পঞ্চকোষের (অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়) বিজ্ঞানময় কোষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ভিতরে ওঙ্কারকে জাগ্রত করা। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা ছিলেন যৌগিক কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্ত।

ধর্ম জিজ্ঞাসা—এগারো

ভারতের জীবন বেদ : সেবা পরম ধর্ম

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রাজা রন্তিদেব। চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরতের বংশধর। বাবা সংকৃতি। রাজা হলেও রন্তিদেবের জীবনের ব্রত ছিল সেবা। জনসেবা। প্রজাদের সন্তানস্নেহে পালন করা। সেবাব্রতী রাজা রন্তিদেবের আরাধ্য ছিলেন বিষ্ণু। জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা মোক্ষলাভ। বিষ্ণুর চরণে স্থান পাওয়ার জন্য ব্রতী তিনি।

এই পাওয়ার জন্য সব মানুষের মধ্যেই দেবতাকে দর্শন করতেন তিনি। কেবল মানুষ নয়, সর্বভূতেই তিনি দেখতেন তাঁর দেবতাকে। মানুষের সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শরিক হয়ে তা দূর করাকেই সাধনা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। তাই প্রজাকে শোষণ নয়, তাদের আপন করে নিয়েছেন, তাদের জন্য সব সম্পদই বিলিয়ে দিতেন তিনি অক্লেশে মনে করতেন এটাই হলো প্রকৃত সেবা। সেই সেবাই ছিল তাঁর সব সাধনার সেরা সাধনা।

এহেন সদাসেবাপরায়ণ প্রজাপালক রাজা রন্তিদেবের রাজ্যে হঠাৎই বড়ো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল সূর্য। তার খরতাপে তাপিত হলো রন্তিদেবের রাজত্ব। আকাশ থেকে উধাও হলো জলভরা চেরাপুঞ্জি বা মৌসিনগ্রামের মেঘ। টানা বৃষ্টিহীন রাজ্যে মাঠঘাট সব গেল শুকিয়ে। চাষবাস দূরে থাক, তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত হয়ে গেল প্রায় ডুমুরের ফুল। পরিণতিতে রাজ্যে দেখা ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। পেটে অসহ্য ক্ষুধা কিন্তু এক দানা শস্য পাওয়াও প্রায় দুর্ঘট। সকলের ঘরেই হাহাকার। হা-অন্ন, হা-অন্ন আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস।

প্রজাদের এহেন দুর্দশায় কেঁদে উঠল রাজার হৃদয়। তিনি হাট করে দিলেন তাঁর ভাণ্ডার। ধনরত্ন থেকে শুরু করে শস্য সবই বিলিয়ে দিতে থাকেন। প্রজার দুঃখে কাতর রাজা রন্তিদেব প্রতিজ্ঞা করলেন, একজন প্রজাও অভুক্ত থাকলে তিনি জল পর্যন্ত খাবেন না। সুকঠোর তাঁর সেই ভীষণ তপস্যা ও সেবার রূপ দেখে বিস্মিত দেবতারাও। মন্ত্রী, সভাসদরা রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞায় অটল। ইন্দ্র যদি বর্ষণ না করে, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যদি অপসৃত না হয় তাহলে তিনি থাকবেন উপবাসী। তাতে যা হবার তাই হোক।

রাজার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আরও একটি কারণ অবশ্য ছিল। অফুরন্ত তাঁর সম্পদ। তাই জনসেবা বা প্রজাকল্যাণে সেই অর্থ বিতরণ করে তিনি পেতেন এক ধরনের মানসিক আনন্দ।

কিন্তু খরা ও দুর্ভিক্ষের ফলে প্রজাদের কাছ থেকে আদায় হচ্ছিল না কিছুই। আদায় হচ্ছিল না কথাটা বলা একটু ভুল। কেননা, তিনিই আদেশ দিয়েছিলেন, অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কারও কাছ থেকে নেওয়া হবে না কোনো ধরনের কর। তাই রাজভাণ্ডার থেকেই ব্যয় হচ্ছিল সব অর্থ। মাটির কলসী যত বড়োই হোক, তা যদি ভর্তি না করা হয় তাহলে তো একদিন তা খালি হবেই। রন্তিদেবেরও হলো সেই অবস্থা। সুদীর্ঘকালীন খরা ও দুর্ভিক্ষের ত্রাণ চালাতে গিয়ে একদিন নিঃশেষ হলো তা। প্রজাদের জন্য একটি কপর্দকও খরচ করতে না পারার অবস্থার পরই রাজা নিলেন ওই কঠিন ব্রত পালনের সিদ্ধান্ত।

অভিযোগ তাঁর ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বর্ষণ না করার জন্য। প্রার্থনা তাঁর আরাধ্য বিষ্ণুর কাছে— প্রজাদের এই দুর্দশা যে তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই প্রয়োজনে তাঁর জীবন নিয়েও বিষ্ণু বাঁচান তাঁর এই অসহায় প্রজাদের। আর সেইসঙ্গে তাঁর সদা দানব্রত অব্যাহত রাখারও সুযোগ করে দিন।

একদিন-দুদিন করে কেটে গেল আটচল্লিশটা দিন। ক্রমাগত অনশনে রাজার জীবন যেন দেহ ছাড়ার পূর্ব-মুহূর্তে এসে পৌঁছল। এতদিন কারও কোনো অনুরোধেই কান দেননি রাজা। ভঙ্গ করেননি সংকল্পিত উপবাসও। ঊনপঞ্চাশ দিনের দিন রাজার অবস্থা দেখে মন্ত্রীরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। কোনো রকমে

খুব সামান্য একটু ঘি-আর মধু মেশানো আহার্য নিয়ে এলেন তাঁরা।

রাজা কিন্তু আগের সিদ্ধান্তেই অটল। কিছুতেই খাবেন না তিনি এইসব। মন্ত্রীরা এবার কেঁদে বলেন, মহারাজ, যদি আপনার জীবনই চলে যায়, তাহলে কেমন করে শেষ করবেন আপনার সংকল্পিত ব্রত? আপনি না থাকলে আপনার প্রজারাই-বা কেমন করে বাঁচবে? তাছাড়া আপনি তো বিলাস বা পরিতৃপ্তির জন্য এই আহার্যটুকু খাচ্ছেন না। জীবনটা যাতে বাঁচে তারই জন্য তো এই সামান্য আহারের ব্যবস্থা। দয়া করে আপনার জন্য নয়, আপনার প্রজাদের পালনের কাজটা সম্পন্ন করার জন্য এই সামান্য আহারটুকু গ্রহণ করুন।

মন্ত্রীদের যুক্তিটা মন দিয়ে শুনলেন তিনি। এটাই তাঁর স্বভাব। আগোগোড়াই তিনি মন্ত্রীদের মন্ত্রণা শোনেন মন দিয়ে। তারপর নিজের প্রজ্ঞায় পর্যালোচনা করে নেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রেও করলেন তাই। বুঝলেন মন্ত্রীদের কথার মধ্যে সারবস্তু রয়েছে। প্রজাদের সেবা ও কল্যাণের জন্যই তাঁকে বাঁচতে হবে। এই কঠোর ব্রত পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তো সম্পূর্ণ হবে না ব্রত। সংকল্প করেও কোনো কাজ যদি শেষ না করা হয় তাহলে তো সেই ব্রত ভঙ্গের দায় তাঁকে বহন করতে হবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে।

না, সেটা হবে মহা অধর্মের কাজ। সেই অধর্ম করলে তো তাঁর আরাধ্যর ক্ষমাও পাবেন না তিনি। তাই এবার রাজি হলেন মন্ত্রীদের কথায়। রাজা গ্রহণ করলেন সেই আহার্য। নিজের জন্য সামান্য অংশ রেখে বাকিটা পরিজনদের জন্য রাখলেন ভাগ ভাগ করে। বহুদিন পরে আহার্য পেয়ে পরিজনরা খুশি। তাদের খুশিতে আনন্দে চোখ চিক চিক রাজা রন্তিদেবের।

সকলকে দিয়ে নিজে খেতে বসবেন, এমন সময় সেখানে এলেন এক ব্রাহ্মণ। বলেন, বড়ো ক্ষুধার্ত আমি, বহুদিন কিছু খাইনি। দয়া করে কিছু খাবার দিয়ে প্রাণ বাঁচান আমার।

রাজা তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করেন নানা ভাবে। তারপর নিজের আহার্যের কিছুটা পরিবেশন করলেন তাঁকে। সেই সামান্য আহার্যেই ভারী খুশি ব্রাহ্মণ। পরিতৃপ্তির উদ্‌গার তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নেন তিনি।

রাজা আবার হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন, এমন সময় দুয়ারে এলো এক ভিক্ষুক। কাতর স্বরে বলে, মহারাজ— বহুদিন আমি উপবাসী। ক্ষুধায় কণ্ঠাগত আমার প্রাণ। দয়া করে কিছু খেতে নিন আমাকে।

রাজা বলেন, আমার অবস্থাও মোটেই ভালো নয়। এই সামান্য আহার্য রয়েছে আমার জন্য। এসো এটাই ভাগ করে খাই আমরা।

খাদ্য পাওয়া যাবে শুনেই ভিক্ষুক উজ্জীবিত। পরম আগ্রহে বলে, দিন মহারাজ, ওই সামান্যই অসামান্য আমার কাছে। ওতেই প্রাণ বাঁচবে আমার।

রাজা নিজের সেই খাবারের বেশিরভাগটাই দেন সেই ভিক্ষুককে। বহুদিনের পর ওই খাবার খায় ভিক্ষুকটি পরম তৃপ্তিতে। তারপর রাজার 'জয়' 'জয়' করে বিদায় নেয় সেখান থেকে।

বারবার খাবারে এভাবে বাধা পড়ায় পরিজনরা চিন্তিত। তাঁরা বুঝতে পারেন না, কেন এমনই বারবার বাধা পড়ছে রাজার আহারে। বুঝতে পারেন না কী লেখা আছে রাজার কপালে?

রাজা কিন্তু নির্বিকার। তাঁর ভাগের আহার্য এভাবে বিলিয়ে দিতে হলেও তিনি অন্তরে অনুভব করেন পরম তৃপ্তি। দীর্ঘ উপবাসের পরও তাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। এসবই যে হচ্ছে তাঁর আরাধ্য বিষ্ণুর কৃপায় এমন উপলব্ধিতে তিনি বারবার প্রণাম জানাতে থাকেন তাঁকে। বিষ্ণুস্তবে মুখর হন তিনি।

প্রার্থনা সেরে রাজা অবশিষ্ট সেই সামান্য আহার্যটুকু খেতে বসবেন এমন সময় সেখানে আসে এক ব্যাধ একপাল কুকুর নিয়ে। সকাতর বিনতিতে লুটিয়ে পড়ে ব্যাধ। বলে, বহুদিন—বহুদিন কিছু জোটেনি আমার এবং এই কুকুরগুলির। এখন আপনি যদি কিছু না দেন, তাহলে আপনার এই দুয়ারেই জীবন যাবে আমাদের। দয়া করে সেই অনর্থকে আটকান আপনি।

রাজা বলেন, ভেব না তোমরা, আমি নিশ্চয় কিছু দেব। তবে তা তোমাদের সমুদ্র-সমান ক্ষুধার সামনে সামান্য গোষ্পদ। তবুও তোমরা এইটুকু নিয়েই অনুগ্রহ করো আমাকে। প্রজাকে বাঁচানোর রাজধর্মটুকু পালনে সাহায্য করো আমাকে।

কথাগুলি বলতে বলতে চোখে জল ভরে আসে রাজা রন্তিদেবের। বলেন, এমনি অপদার্থ রাজা আমি যে আমার বুভুক্ষু পুত্রসমান প্রজাদের আমি পর্যাপ্ত খাবার দিতে পারছি না। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে ধন্য করো আমাকে।

এই বলে রাজা সেই অবশিষ্ট আহারটুকুও তুলে দেন সেই ব্যাধকে। এখন রাজার পাত্র একবারেই শূন্য। সামান্য খাবারও নেই আর আছে কেবল একটু জল। সেই জলটুকু পান করেই জীবন বাঁচাতে সচেষ্ট হন রাজা।

কিন্তু সত্যিই বিধি বোধহয় বাম। রাজা জলটুকু পান করবেন এমন সময় সেখানে আসে এক চণ্ডাল। বলে, মহারাজ, বাঁচান আমাকে। বহুদিন উপবাসী আমি। কিন্তু কোনো আহার আমি চাই না। শুধু সামান্য একটু জল— একটু জল দিয়ে বাঁচান আমাকে। জলের অভাবে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি আর কোনো কথা বলতে পারছি না, দয়া করে আমাকে সামান্য একটু জল দিন তৃষ্ণা মেটাবার জন্য।

রাজা কোনো দ্বিধা না করেই তাঁর শেষ সম্বল সেই জলটুকু তুলে দেন চণ্ডালের হাতে। আর মহা-তৃষ্ণার্ত সেই চণ্ডাল মুহূর্তে সবটুকু জল পান করে বলে, বাঁচলাম। আপনি আমাকে বাঁচালেন।

রাজা কিন্তু চোখ বুজে মনে মনে তখন তাঁর আরাধ্যকে বলে চলেছেন, হে প্রভু,

অর্থ নয়, ক্ষমতা নয়, তুমি আমাকে কেবল মানুষের দুঃখ দুর্দশাটুকু অনুভবের শক্তি দাও, তাহলেই চিরকৃতার্থ থাকবো।

ওদিকে চণ্ডালটি জলপান করার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ উপবাস সত্ত্বেও রাজা যেন নতুন জীবন পান। তাঁর সব ক্লান্তি, সব অবসাদ, সব দুর্বলতা তখন বিগত দিনের স্মৃতি। যৌবনের দীপ্তিতে তিনি তখন যেন সেই যৌবনের রাজা রন্তিদেব। তারুণ্যের শক্তিতে তরতাজা রাজা রন্তিদেব তাঁর এই অন্তর্নিহিত পরিবর্তনে বিস্মিত। বুঝতে পারেন না কোনো অলৌকিক প্রভাবে তাঁর মধ্যে খেলা করছে এমন পরিবর্তনের জোয়ার-ভাটা। পারেন না বলেই প্রার্থনা ভুলে চোখ খোলেন তিনি। আর তখনই ঘটে আর এক আশ্চর্য দর্শন।

দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ত্রিমূর্তি— সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, সংরক্ষক বিষ্ণু বা জগন্নাথ এবং বিনাশক মহেশ্বর। ত্রিমূর্তির সেই দিব্য বিভায় বিভাসিত চারিদিক। এক অমৃতগন্ধে আমোদিত সেই পরিবেশে। রন্তিদেব তখন বাক্‌রহিত। তাঁর দু' চোখে তখন আনন্দ নীর। সেই আনন্দেই তিনি লুটিয়ে পড়েন তাঁদের পায়ে।

শোনেন তাঁদের অমৃতনিস্যন্দি কণ্ঠের বাণী,— তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যই আমরা এসেছিলাম বিভিন্ন রূপে। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো তুমি। প্রকৃত অর্থেই তুমি জনসেবক। সেবা ধর্ম পালনের অনন্য নিদর্শন হয়ে রইলে তুমি।

রাজা রন্তিদেব তখনও বাক্যহীন। তাঁর সে অবস্থা দেখে স্মিত হাস্যে মুখর হন বিষ্ণু। তাঁর মুখের সে হাসিতে যেন সহস্র-অযুত চাঁদের জোছনা ছড়িয়ে পড়ছে। স্নিগ্ধ মধুর সে হাসি। বলেন তিনি, শোনো রাজা, তোমার সাধনার রূপ দেখে পরিতুষ্ট আমি। তোমার মতো সেবাপরায়ণ ভক্ত আমি কমই দেখেছি। আজ তুমি তোমার সাধনায় সত্যিই সিদ্ধ হয়েছ। এবার বলো, কী চাও তুমি? অর্থ-সম্পদ-ক্ষমতা— বলো-বলো কী চাও তুমি? আজ আমি তোমার সামনে আবির্ভূত হয়েছি কল্পতরু রূপে। আজ আমি তোমার সব কামনা-বাসনা চরিতার্থ করব। বলো— জানাও তোমার প্রার্থনা।

রন্তিদেব বলেন, রাজ্য, সম্পদ, অর্থ— কিছুই চাই না আমি। চাই কেবল তোমার রাতুল চরণে একটু ঠাঁই। চাই শুধু তোমাকে— শুধু তোমাকে।

বিষ্ণু কিন্তু আবারও বলেন, শোনো রাজা, তুমি যদি আমার আরাধনা এই ভাবেই করে যাও তাহলে তোমার আর কোনো দুঃখযন্ত্রণাই থাকবে না। পাবে পার্থিব সব সম্পদ। জগতের সব কিছুর অধিকারী হবে তুমি।

রন্তিদেব বলেন সেই একই কথা, ওসব আমার চাই না। আমি চাই কেবল মোক্ষ।

বিষ্ণু বলেন, বেশ, তাই হবে। যে সেবা ধর্ম তুমি পালন করেছো নিষ্ঠার সঙ্গে— তারই মূল্যে তুমি হবে পরমযোগী। এরপর আমারই সান্নিধ্যে যোগমগ্ন থাকবে তুমিও অন্য আরও বহু যোগীর মতো। অন্তর্হিত বিষ্ণু। রাজাও পূর্ণকাম।

মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে রয়েছে রন্তিদেব সম্পর্কে আরও কিছু কাহিনি। এই সব কাহিনি অথবা রন্তিদেবের জীবনচর্যা থেকে ওঠে আসছে ভারতীয় সনাতন ধর্মের মর্মকথা। সনাতন ধর্মে যে সেবার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে, সেবার মধ্য দিয়েই যে ঈশ্বরলাভ করা যায়, সেবাধর্মে অবিচলিত থেকে রাজ্যশাসন বা গার্হস্থ্যধর্ম পালন যাই করা হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তা মানুষকে পৌঁছে দেয় তার কাঙ্ক্ষিত জায়গায়। কেবল তাই নয়, হৃদয়ে সেবার ভাবটি জাগিয়ে রেখে মানুষ যে কাজেই হাত দিক না কেন, শেষ পর্যন্ত সাফল্য তাতে আসবে। আর সে কারণেই ভারতীয় শাস্ত্রগুলিতে নানা প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে— সেবাই পরমধর্ম। ভারতীয় সেনাবাহিনীও তাদের অভীপ্সা অথবা আদর্শ হিসেবে নিয়েছে শাস্ত্রীয় ওই মহাবাক্য— 'সেবা পরম ধর্ম'। ভারতের সেনা চিকিৎসক বাহিনীর আদর্শও একটু রূপান্তরে ওই একই কথা— 'সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'— সকলে সুস্থ থাক— নীরোগ দেহে বাঁচুক সকলে। সীমান্ত বাহিনীর আদর্শে বিষয়টি আরও একটু প্রাঞ্জল— 'সেবা-সুরক্ষা-বন্ধুত্ব'। যার গূঢ়ার্থ— সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করলেই সুদৃঢ় হয় সুরক্ষা ব্যবস্থা, গড়ে ওঠে বন্ধুত্বও।

সেবার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি। সব জীবনের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন করে যাঁরা জীব সেবা করেন— তাঁদের কাছে সব মানুষ ও অতিথিই নারায়ণ। তাই নরসেবাই হলো জীবসেবা। এটাকেই একটু অন্য ভাবে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ— শিব রূপে জীব সেবা। বলা হয়, 'সেবা ধর্ম পরমো গহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ' কোনো না কোনো ভাবে উপকৃত হতে পারে এমন সকলকেই সেবা করা যায় বা করা উচিত। ক্ষুধার্থ মানুষ, তৃষ্ণার্ত পথিক বা আহত কুকুর-পশু-পাখি এমনকী ক্ষীয়মাণ গ্রন্থের সেবাও সেই ঈশ্বরেরই সেবা— এখন কথাই রয়েছে সনাতন শাস্ত্রগুলিতে।

সনাতন ধর্মে অন্যের সেবা অথবা প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি আত্মনিগ্রহ করতে হয়, সেটাও সেই ঈশ্বর সেবা। এই বোধ থেকেই বাজের প্রাণ বাঁচাতে রাজা শিবি নিজের শরীরের মাংস পর্যন্ত কেটে দিতে এতোটুকু ইতস্তত করেননি।

শাস্ত্রের বচন হলো, পরোপকারম্ পুণ্য— অন্যের উপকার করাটাই পুণ্য আর পাপ হলো পরপীড়নম্— পরপীড়নই পাপ। এই সেবার কথা বলতে গিয়ে মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৫৮) বলা হয়েছে, নিজে যা চাও বা আকাঙ্ক্ষা করো— সেটাই চাইবে অন্যের জন্য, করবেও তাই। নিজে যেটা চাওয়া হয় না— শত্রুর জন্যও সেটা কামনা করা উচিত নয়।

সেবা হলো দান। তাই গীতায় আরও একটু প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে, প্রতিদানের আশা বা চিন্তা না করেই দান করা কর্তব্য। আর এরই চরম প্রকাশ 'আমিই ব্রহ্ম' এই বোধ। সেদিক থেকে অন্যের সেবা করার অর্থ নিজেরই সেবা করা। সে কারণে সেবার চেয়ে সেরা ধর্ম আর কিছু নেই। ◻

জানা অজানা ব্রহ্মপুত্র

ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস

জানার পরিধির বাইরেও কিছু না কিছু অজানা তথ্য থেকেই যায়। চীনের (তিব্বত), ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সদা প্রবাহিত এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ নদী ব্রহ্মপুত্র। এই নদীটি সম্পর্কেও অনেকের অনেক কিছুই অজানা, তাই কিছু তথ্য দিয়ে এই প্রতিবেদন।

এই ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের মানস সরোবর থেকে কিছুটা পূর্বে অবস্থিত ‘টামচুক্ খামবার’ নামের এক হিমবাহের (প্রায় ৩১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা এং ৮২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা) থেকে এবং বিভিন্ন নামে এই নদীটি অরুণাচল, অসম ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৮০ কিলোমিটার। এই

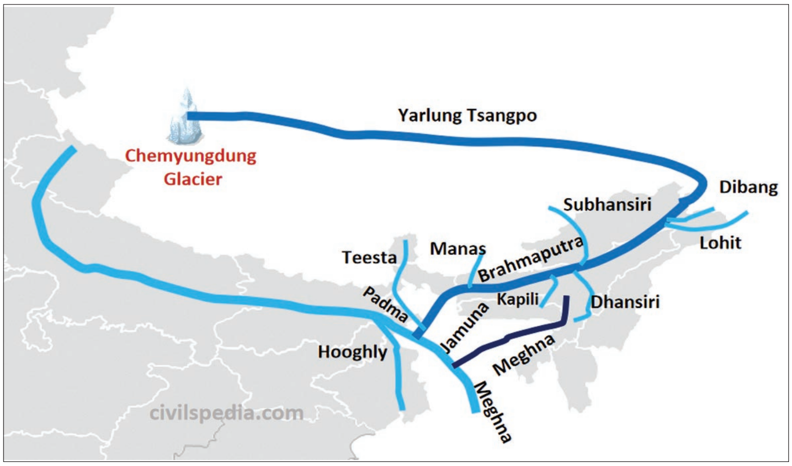

সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ১৬২৫ কিলোমিটার চীন (তিব্বত) দেশে, ৯১৮ কিলোমিটার ভারতে (৭২৫ কিলোমিটার অসমের ভূমিতে) ও ৩৩৭ কিলোমিটার বাংলাদেশে প্রবাহিত।

উৎপত্তিস্থল থেকে কিছু দূর প্রবাহিত হওয়ার পর এই নদীটি তিব্বতের ‘পে’ (Pe, উচ্চতা ৩৫০০ মিটার) থেকে এক গিরিখাতসমৃদ্ধ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। তারপর আরও কিছুদূর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে উচ্চ হিমালয়, মধ্যহিমালয় ও উপহিমালয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর অরুণাচল প্রদেশের ‘পাসিঘাট’ এ এই নদীর সমতল প্রবহমান রূপটি দেখা যায়।

পৃথিবীর কোনো নদীর হয়তো এত নামের বৈচিত্রতা নেই, যতটা আমরা দেখি ব্রহ্মপুত্র নদীর নামের মধ্যে। উৎসস্থলে এর নাম ‘মুটসুং সাংপো’ (Mutsung tsangpo), এরপর ‘মগহুং সাংপো’ (Moghung Tsangpo) এবং শেষে সাংপো (Tsangpo)। তিব্বত অঞ্চলে এই নদীর আরও কিছু নাম দেখা যায়। সেগুলো হচ্ছে— নরিচু সাংপো (Narichu Tsangpo), টাঞ্জু খাম্পা (Tanjoo Khampa), য়েরে সাংপো (Yere Tsangpo), কাইচু (Kyichu) ইত্যাদি।

অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এই নদী সিয়াংস দিহাং, শ্যামা, শেমা, সেংলাই ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। তারপর অসমে এই নদী, দিবাং ও লোহিত নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে প্রবহমান হয়ে চলেছে। অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে এই নদীর আরও কিছু নাম শোনা যায়, যেমন, লোহিত, লুইত, বরলুইত, বুড়ালুইত ও ছিরিলুইত।

অসম অতিক্রম করার পর দক্ষিণমুখী হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে, ছোটো শাখাটি ব্রহ্মপুত্র, আর মূল শাখাটি যমুনা নামে পরিচিত। এক স্থানে গঙ্গা এসে সংযোগ হওয়ার পর ‘পদ্মা’ নাম নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ‘মেঘনা’ নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে।

উৎসস্থলে এই নদী প্রস্থে ১০০ মিটার হয়ে থাকলেও অসমের ডিব্রুগড়ের নদী অঞ্চলে এই নদীর প্রস্থ হয়েছে ১০ কিলোমিটার কিন্তু এরপর এই নদী প্রস্থে কমে গিয়ে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার হয়েছে। অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে এই নদীর সঙ্গে এসে মিশেছে ছোটো-বড়ো মিলে ১০৫টি উপনদী। এর মধ্যে ৬৪টি এসেছে উত্তর দিক থেকে আর ৪১টি এসে মিশেছে দক্ষিণ দিক থেকে। পৃথিবীর বৃহত্তম নদীদ্বীপ সমূহের অন্যতম ‘মাজুলি’ (৯২৯ বর্গকিলোমিটার) এবং পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীদ্বীপ ‘উমানন্দ’ (১৩ বিঘা ৩ কাঠা) ব্রহ্মপুত্রের বুকেই অবস্থিত।

সর্বমোট জলধারণ ক্ষমতার বিচারে ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর অন্যতম এক নদী। ধুবরীর কাছে এই নদী গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ২২০০০ ঘনমিটার জল প্রবাহিত করতে সক্ষম। বর্ষার সময় এই পরিমাণ ৯০০০০ ঘনমিটার পর্যন্ত হওয়া দেখা যায়।

বিশাল এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শহর, মঠ ও মন্দির। প্রবাহিত অঞ্চলে এই নদীকে অধিকাংশ লোকই দেবজ্ঞানে পূজা করে থাকে। এই পবিত্র নদীর তীরে অবস্থিত জনসাধারণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনজীবনে এই নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বর্তমান অসমে এই নদীর উপর দিয়ে নির্মিত সেতুর মোট সংখ্যা ৫টি— ‘শরাইঘাট’ (১.৪৯২ কিলোমিটার), ‘কলিয়াভোমোরা (৩.০১৫ কিলোমিটার), ‘নরনারায়ণ’ (২.২৮৫ কিলোমিটার), ‘বগীবিল’ (৪.৯৪ কিলোমিটার) এবং ‘ভূপেন হাজারিকা’ (ঢলা-শদিয়া) সেতু (৯.১৫ কিলোমিটার)। পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের ভিত্তিতে নদীর জলাধারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। দীর্ঘস্বর কারান্ত স্ত্রীবাচক নামের জলাধারকে যেমন, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী ইত্যাদিকে ‘নদী’ এবং হ্রস্বস্বর কারান্ত পুরুষবাচক নামের জলাধারকে বলা হয় ‘নদ’। এই বিচারে কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, নীল নদীসমূহ ‘নদ’।

মোদী সরকারের ন' বছর

কৃষি ও কৃষকের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার সালতামামি

কল্যাণ গৌতম

ন' বছরের মোদী সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক মূল মন্ত্র হচ্ছে, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস।' অর্থাৎ সকলকে নিয়ে চলা, সকলের সঙ্গে চলা, সকলের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করা এবং সকলকে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে শামিল করা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ কৃষকই গরিব এবং তারা গ্রাম-ভারতে অবস্থান করেন। এই গরিব ও প্রান্তিক মানুষের জন্য সেবা, সুশাসন এবং গরিব কল্যাণের যে যে কর্মসূচি মোদী সরকার সম্যকভাবে বিগত নয় বছর ধরে গ্রহণ করে এসেছেন, তার সুফল আরও অধিক কৃষকের কাছে পৌঁছে দেবার নামই হবে যথার্থ উন্নয়ন। কৃষক-কেন্দ্রিক প্রকল্প রূপায়ণে কোনো রাজ্য সরকারের গড়িমসি, মিথ্যাচার, বিরোধিতা মোটেই কাম্য নয়।

দরিদ্র মানুষের পাশে :

গরিব মানুষের জন্য মোদী সরকারের এক ডজন সাফল্যের খতিয়ান :

১. আশি কোটি মানুষ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায়।

২. প্রায় বারো কোটি বাসিন্দার কাছে পৌঁছে গেছে কলের জল।

৩. তিন কোটির অধিক মানুষ গ্রামে ও শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহলাভ করেছেন।

৪. প্রায় বারো কোটি টয়লেট তৈরি হয়েছে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে।

৫. প্রায় পয়ত্রিশ লক্ষ রাস্তার হকার PM SVANidhi প্রকল্পে ঋণ পেয়েছেন।

৬. প্রায় চল্লিশ কোটি ঋণ আবেদন মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

৭. সাংবিধানিক স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল কমিশন অব ব্যাকোয়ার্ড ক্লাসকে।

৮. প্রায় কুড়ি কেটি মহিলার কাছে করোনা পরিস্থিতিতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

৯. স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৩৫১ কোটি টাকা তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ পেয়েছেন।

১০. বর্তমান ভারতবর্ষে ৬০ শতাংশ মন্ত্রী এস.সি., এস.টি. বা ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

১১. ২০১৪ সালের আগে যত না একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার চাইতে ৫ গুণ বেশি বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে ২০১৪ সালে মোদী সরকার আসার পর।

১২. বিভিন্ন প্রদেশ মিলিয়ে ১১৭টি অ্যাসপিরেশনাল জেলা গঠিত হয়েছে উন্নয়নের নিরিখে।

প্রান্তিক জনগণের কল্যাণ সাধন :

কীভাবে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার একটি প্রাসঙ্গিক তালিকা দেওয়া হলো :

১. যে সমস্ত দরিদ্র কৃষক প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় আছেন, তার ৭১ শতাংশ কৃষকই এস.সি.এস.টি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

২. পিএম কিষাণনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এস.সি/এস.টি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৩. যে গৃহ PMAY(G) প্রকল্পে হয়েছে তার ৪৫.৪৫ শতাংশ এস.সি/এস.টি সম্প্রদায়ের মানুষ পেয়েছেন। স্কলারশিপ গ্রহীতাদের ৫৮ শতাংশ এস.সি/এস.টি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৪. চল্লিশ কোটি মুদ্রা যোজনায় সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের ৫১ শতাংশ এস.সি/এস.টি/ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত।

কৃষকের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত এই সরকারের যদি বিগত দিনের কাজ ও বর্তমান সময়ের পরিকল্পনার হদিশ করি, তবে দেখবো কত বৃহৎ ও ব্যাপক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেছে মোদী সরকার।

১. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২২-২৩ বর্ষে ৫.৭ গুণ বাজেট বরাদ্দ কৃষিখাতে বেড়েছে।

২. কৃষি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা।

৩. ১১ কোটির অধিক কৃষক পিএম কিষাণনিধি প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন।

৪. প্রায় ২৩ কোটি সয়েল হেলথ্ কার্ড বা মৃত্তিকা স্বাস্থ্যের বিবরণী নথি বিতরণ করা হয়েছে, যা থেকে মাটির গুণগতমান জানতে পারবেন কৃষকেরা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

৫. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে নন-বাসমতি চাল রপ্তানি ১০৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. তৈলবীজের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কৃষকদের প্রদান করে যে সংগ্রহ অভিযান চলেছে,

ফ ঃ ৫

তা ১৫০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশে তৈলবীজ উৎপাদন প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. ডালশস্যের ক্ষেত্রে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস কৃষকদের প্রদান করে যে সংগ্রহ অভিযান চলেছে, তা ৭৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশে প্রোটিন সমৃদ্ধ আহার ডালচাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. ২০২১-২২-এর চাইতে ২০২২-২৩ বর্ষে সারে ভর্তুকি বেড়েছে ৫০০ শতাংশ।

৯. ২০২৩-২৪ বর্ষে কৃষি খাতে ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০ লক্ষ কোটি টাকা।

১০. প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা খাতে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকার দাবি মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বীমার টাকা পেয়ে ক্ষতি সামলাতে পেরেছেন।

১১. চাষ করতে লাগে জল। ২০২১-২৬ এই পাঁচ সালের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা বা সেচের জল জোগানের পরিকল্পনায় ৯৩,০৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১২. ই-নাম (eNAM) প্রকল্পের আওতায় ১,২৬০টি মান্ডি এসেছে এবং কৃষি সামগ্রী বেচা-কেনা কাজে গতি এসেছে।

মনে রাখবার মতো কাজ :

কৃষি উন্নয়নের নিরিখে নরেন্দ্র মোদী সরকারের যে কথাগুলি মানুষ মনে রাখবে, তা হলো :

১. ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষককে রক্ষা করা ও আগলে রাখার মানসিকতা এই সরকারের পুরোদমে রয়েছে।

২. এমএসপি বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস বৃদ্ধি করেছে এই সরকার। খরচের ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করে ধার্য করা হয়েছে ফসল বিক্রির ন্যূনতম মূল্য, যাতে অভাবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য না হয় চাষি, ফসল চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে।

৩. পিএম কিষাণনিধি প্রকল্পে ১১ কোটির বেশি কৃষক প্রত্যেকে বছরে ৬ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন। এ বড়ো কম কথা নয়। চাষ করে, ফসল বিক্রি করে লাভ তো আছেই, বিমা করা আছে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তার উপর বছরে এই অতিরিক্ত নিশ্চিত টাকা কৃষককে চাষের মধ্যে থাকতে আশ্বস্ত করেছে।

৪. শাস্ত্রে আছে 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' অর্থাৎ চাষই কেবল করো। এটাই কৃষককে সম্মান জানানোর জন্য সরকারি প্রচেষ্টা। ফসল বিমার যে বন্দোবস্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেছে, তার জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ যৎসামান্য। অথচ ফসল ফলাতে গিয়ে নানাভাবে চাষ মার খেলে কৃষক তার প্রাপ্য টাকা ফসল বিক্রি ছাড়াই পেয়ে যাবেন। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা খাতে ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা কৃষকের দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। বিমার টাকা পাবার পথ আরও সহজ ও সাধাসিধে হয়েছে।

৫. একটি প্রবাদ আছে 'আশায় মরে চাষা', বৃষ্টির জন্য প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে হতো। সব জায়গায় তো আর বড়ো নদী পরিকল্পনায় সেচের জলের সুবিধা নেই! বৃষ্টির উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে দিতে পেরে কৃষিকাজকে নিশ্চিত করেছে এই সরকার। যদিও অন্য পরিকল্পনায় বর্ষার জল ধরা ও জল ভরার প্রাকৃতিক প্রকল্পের সদ্ব্যবহারও রয়েছে। মোট ৭৭,৫৯৫ কোটি টাকা নিয়োজিত করে ৯৯টি ইরিগেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে এই সরকার, যা কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে যুগান্তকারী উদ্যোগ।

৬. সর্বকালের জন্য সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এই আমলেই। ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ২৬৫.০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল, ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৩.৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। কৃষিক্ষেত্রে সর্বোত্তম গরিমাময় একটি দেশ।

৭. কৃষকের এখন আয় বৃদ্ধির নানান পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে এই সরকার। ব্যারেন ল্যান্ড বা পতিত অকর্ষিত জমিতে সৌর প্যানেল বসিয়ে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৮. চেষ্টা চলছে দুধ উৎপাদন বাড়িয়ে চাষির আয় বাড়াতে। ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০২১-২২ সালে বার্ষিক দুধ উৎপাদন বেড়েছে ৫১.০৫ শতাংশ।

৯. মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে পৃথক মন্ত্রক তৈরি হয়েছে। যথার্থ 'নীল বিপ্লব' আসবে এই মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে।

১০. বিগত নয় বছরে মধুর উৎপাদন বেড়েছে তা নয়, বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। একেই বলা যায় মিষ্টি বিপ্লব।

১১. ২০১৩-১৪ সালের চাইতে ২০২১-২২ সালে কৃষিক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে ইথানল তৈরির পরিমাণ ৩৮ কোটি লিটার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৪ কোটি লিটার।

১২. রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২৩ সালকে International Year of Millets বা আন্তর্জাতিক মোটাদানা শস্যের বছর বা শ্রীঅন্ন বছর বলে চিহ্নিত করেছে। এই কোর্স গ্রেইন বা মোটা দেশীয় দানাশস্যের মধ্যে প্রভূত পুষ্টিমূল্য রয়েছে, যা দেশের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য একটি দারুণ উৎস। এগুলি সাধারণ মানুষের ফসল, এগুলিকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতবর্ষ এই উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। কারণ বহু বিচিত্র মোটাদানার শ্রীঅন্ন যেমন জোয়ার, বাজরা, রাগি, কোদো, মারুয়া ভারতে উৎপন্ন হয়। এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে ২০২১ সালের মার্চ মাসে ভারতই উত্থাপিত করে এবং ৭২টি দেশ তা সমর্থন করে। এভাবেই ২০২৩ সালে পালিত হচ্ছে মিলেট বর্ষ বা শ্রীঅন্ন বর্ষ। গরিব মানুষকে তাদের হাতের নাগালে থাকা পুষ্টিকর শস্য-সম্পদে ভরিয়ে দিতে হবে গোলা।

কৃষি আইন, যা সম্ভব হলো না, কৃষির দালালরাজের বিরোধিতায় :

যে কৃষি আইনের বিরোধিতা করেছিল বিরোধীরা, তা বলবৎ হলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা কতটা উপকৃত হতেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি বিষয়ক তিনটি বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পেশ ও উত্তীর্ণ হয়ে, ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে আইনরূপে বলবৎ হয়েছিল। পরে তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। আইনগুলি হলো— ১. কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি) আইন বা এফপিটিসি অ্যাক্ট; ২. কৃষক (ক্ষমতায়ন ও রক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা আইন বা এফএপিএএফ অ্যাক্ট এবং ৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন বা ইসিএ অ্যাক্ট। এই আইনগুলি চালু হলে বাজারের প্রথাগত প্রাঙ্গণের বাইরে বাধাহীন হতো অন্তর্রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। কৃষকদের সরাসরি বিপণনে জড়িত হতে সাহায্য করতো এই আইন, মধ্যস্থতাকারীদের অবস্থানও দূর করতো, ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতো। কৃষি বিপণন

ব্যবস্থায় এক ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে পরিকাঠামোগত বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল হতো। গ্রামে গ্রামে কোল্ড স্টোরেজ, গুদামঘর ইত্যাদি তৈরি হতো এরই ফলশ্রুতিতে। আর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এপিএমসিগুলি বা Agricultural Produce Market Committee-গুলি কৃষকদের আরও সুবিধার বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হতো।

প্রতিক্রিয়াশীল এবং দেশবিরোধী চক্র কৃষি আইনের বিরোধিতা করছিল। যে কৃষি বিল চাষির জন্য আশীর্বাদ হতে পারতো, তার বিরোধিতা কেন করা হলো? বিষয়টি দাঁড়িয়ে ছিল দুটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর, কেউ কৃষকের স্বার্থ দেখছেন না, মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থের কথা ভাবছেন। কৃষকের জন্য কেউ কেউ মায়াকান্না কেঁদে দালালদের জন্য কৃত্রিম প্রেম দেখিয়েছিলেন। তারা দেশের ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষির কথা ভাবেননি, জোতদার শ্রেণীর কৃষকের কথা ভেবেছেন। তারা দুই এক বিঘা জমির মালিক এমন কৃষকের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলে কয়েকশো বিঘা যাদের তাদের স্বার্থ দেখেছেন এবং কৃপাদৃষ্টি করেছেন।

সেই কৃষি আইনে কৃষিপণ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন একটি তন্ত্র রচনার বন্দোবস্ত ছিল, যেখানে কৃষক ও ব্যবসায়ী কৃষিপণ্যের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন, আগে যেটা ছিল না। মান্ডিতে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে যদি কৃষক মনে করতেন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন, যথাযথ দাম পাচ্ছেন না, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা তার জন্য খোলা ছিল। প্রতিযোগিতার এক নতুন ও অন্যতর মার্কেটিং চ্যানেল তৈরির সুযোগ ছিল। ছিল দক্ষ, স্বচ্ছ ও বাঁধাহীন প্রণালী। কৃষিপণ্যের অন্তর্রাজ্য বাণিজ্য সম্ভব ছিল। দৃশ্যমান বাজারের বাইরে বাজার-সদৃশ্য স্থল রচনা হতো। সম্ভব হতো বৈদ্যুতিন বাণিজ্য। আইনের মূল লক্ষ্যটি ছিল, সারা দেশের জন্য সুসংহত ও অভিন্ন একটি বাজার গড়ে তোলা— 'এক দেশ এক হাট'। কেন্দ্র সরকার চাননি, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কাটমানি-খোর মধ্যস্বত্বভোগীরা এঁটুলি পোকার মতে লাভের গুড় খেয়ে ফেলুক। সেই আইনে কৃষক ফসল থেকে বেশি দাম পেতো, লাভবান হতো। তেমনই সাধারণ মানুষ তুলনায় কমদামে ফসল কিনতে পেরে লাভবান হতেন। অর্থাৎ এটি ছিল যেমন কৃষক-বান্ধব আইন, তেমনই আম-জনতার সহায়ক আইন। তবে দালালদের সন্তুষ্টির আইন এটি ছিল না। কৃষিতে লাভ হয় না বলে, যে কৃষক চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন; তার বিপ্রতীপে এই আইন কৃষককে জমি-জিরেতের অভিমুখী করে তুলতো। মান্ডিতে বিক্রি করার জন্য যে শুল্ক লাগতো, এই আইনের ফলে আর লাগতো না। কেউ যদি মনে করতেন, তিনি লেভি দিয়ে মাণ্ডিতেই ফসল বিক্রি করবেন, তার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ যারা বলছেন, মাণ্ডি উঠে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষি সুরক্ষা আইন ছিল চাষের চুক্তি সংক্রান্ত একটি জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক। কৃষককে ক্ষমতাশালী করাই ছিল তার লক্ষ্য। কৃষি এক শিল্পের পর্যায়ের যাচ্ছে, একটি ভৌমশিল্প যেন। নতুন আইনের ফলে ব্যবসায় জড়িত হতেন কৃষক। জড়িত হতেন ব্যবসায়ী ফার্মের সঙ্গে, প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির সঙ্গে, পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে, কিংবা খুচরো ব্যবসায়ীর সঙ্গে। বীজ বোনার আগেই চুক্তি হতে পারতো, কিন্তু চুক্তির এক্তিয়ারটি আসতো ফসল পাকার পর, কেবলমাত্র উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য। এটি আদৌ জমির বন্ধক সংক্রান্ত কোনো চুক্তি ছিল না। কখনই জমি হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা ছিল না। একেবারে ঝকঝকে

পরিচ্ছন্ন একটি পদ্ধতির কথা ছিল আইনে। কৃষকের লাভজনক দাম পাবার কথা ছিল। চাষের শুরুতেই কৃষক লাভের ব্যাপারে স্থিরচিত্ত হতে পারতেন এই আইনে।

তৃতীয়ত, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইনে বলা হয়েছিল যে কেন্দ্র সরকার কেবলমাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সহসা ও মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হলে তবেই খাদ্যশস্য, ডালশস্য, আলু তৈলবীজ ও পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। পচনশীল ও অপচনশীল কৃষি-উদ্যান ফসলের দাম কত শতাংশ বৃদ্ধি পেলে সরকার মজুতদারি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কীভাবে তা করবে, তা সুস্পষ্ট বলা ছিল এই আইনে। কোনোভাবেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বেলাগাম আইন এটি ছিল না। সিমেন্ট, ইস্পাতও পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতার বাইরে চলে এসেছিল, তাতে মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু ইস্পাত ও সিমেন্ট যায়নি। ১৯৫৫ সালে যখন এই আইন লাগু হয় তখন আজকের মতো কৃষি উন্নয়নের পরিস্থিতি ছিল না। আজ দেশে কৃষি উৎপাদন ও তার হার অনেক বেড়েছে। দেশ আজ কৃষিতে স্বাবলম্বী। তাই ৬৫ বছর আগেকার কৃষি নীতি আজকের নীতি হতে পারে না। এই আইনের সংশোধনী সম্পর্কে সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স শ্রীমতী লীনা নন্দন জানিয়েছেন, 'Essential Commodities Act was conceptualised in the era of food shortage...we have moved from scarcity to food security.' নতুন আইনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য থেকে আয়ের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনই দেশে সংরক্ষণ ও শস্যাগার নির্মাণ-শিল্পের সুযোগ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। ফসলের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হবে।

কিন্তু বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু করে দিল মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বিরোধী দলগুলি। বিরোধিতা গণতন্ত্রের পক্ষে সুলক্ষণ। তবে এই বিরোধিতার যুক্তি ও ধরন ছিল আলাদা। যারা আইন বিরোধিতার নামে বসে রইলেন, তাদেরকে কৃষক বলে চেনা যায়নি। আন্দোলনে যাদের মুখ দেখা গেছে, তাদের রণকৌশল কী, স্লোগান কী, ব্যানার-পোস্টারে কী লেখা হচ্ছে— সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ভারতবিরোধী নানান বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি অন্তরালে থেকে কিছু কৃষককে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। যারা মোটেই সামগ্রিক কৃষকের যথার্থ প্রতিভূ নয়। যারা বাজার-দালালি করে কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসলে নিজেদের পরিপুষ্টি ঘটায়, কাটমানিতে ফুলেফেঁপে উঠে, তাদেরই একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ছিল এই আন্দোলন। তারা দেশের কৃষকের নামে তা চালানোর অন্যায় চেষ্টা করে। আন্দোলনের নামে অসত্য ও অর্ধসত্য বিবৃতি দেয় মানুষের সমর্থন পাবার আশায়।

মানুষ বুঝেছিল, কিছু মানুষকে তাড়া করে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন আর একদল মানুষ! দামি গাড়ি ও এলাহি আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হওয়া একদল মানুষ। তারা শতশত বিঘা জমির মালিকানা ভোগ করেন। তারা মান্ডির আড়তদার? তারা বাজার কমিটিতে জাঁকিয়ে বসে থাকা রাজনৈতিক দলের প্রতিভূ। প্রয়োজন ছিল চালচিত্র খুঁটিয়ে দেখা। খোঁজার দরকার ছিল বৈদেশিক যোগাযোগের তথ্যতালাশ। আর এক অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্রের আখ্যানও পাওয়া গেছে।

কৃষিপণ্যের বাজার এবং বাজারের যাবতীয় প্রণালীর প্রতি রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের সংঘটিত ও পরিকল্পিত ভূমিকা নেই। তার ফলে কৃষিতে প্রত্যাবর্তন কম, কৃষকের আয় বেশি নয়। বাজারের সুযোগ গড়ে ওঠেনি বলেই গ্রীষ্মের মাসগুলিতে ভিণ্ডির পাইকারি দর কেজিতে মাত্র দু টাকায় এসে দাঁড়ায়, শীতের সময় ফুলকপি এক টাকা। এই দামে বেচলে কৃষকের দুঃখ কখনও ঘুচবে না। এই দাম পেলে ফসল তোলার খরচও উঠবে না। ধান, গম, আলু, আনাজের মতো ফসলে বিঘা প্রতি খরচ দশ-বিশ হাজার টাকা। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় তা শেষ হয়ে গেলে কয়েক মাস বাদে কৃষকের হাত শূন্য হয়ে যায়। আর ফলন ভালো হলেও রক্ষা নেই, কৃষকের কপাল পোড়ে, ফড়ের পোয়া বাড়ে। এদিকে রাসায়নিক চাষে খরচ বেশি। সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের খরচ, সবকিছুই ধরতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতের বীজ কেনার খরচ আছে। কিন্তু যদি ফলনের কথা চিন্তা করি, তবে প্রাথমিকভাবে উচ্চ ফলন দিলেও, সবমিলিয়ে চাষের লাভজনক আয় চাষিকে দিতে সক্ষম হবে না। রাসায়নিক চাষের ফলে মাটির অণুজীবের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে কমে যায়, মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। জল, বায়ু দূষিত হয়। স্বাস্থ্যসঙ্কট দেখা দেয়, মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। সবমিলিয়ে কৃষক দীন দরিদ্র হয়ে পড়ে।

বিরোধীদের জবাবে সেদিন কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এই বিল চাষিকে বীজ বোনার সময়েই ফসলের দামের গ্যারান্টি দেবে। বিক্রয় চুক্তি কেবলমাত্র উৎপাদনের উপর, তার সঙ্গে কৃষিজমির কোনো উল্লেখ নেই। কৃষক চুক্তি থেকে সরে আসতে পারে, ব্যবসায়ী পারবে না। কৃষক ও তার কৃষিজমি পুরোপুরি সুরক্ষিত। তিনি বিরোধীদের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, কোনোদিনই কি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনের অঙ্গ ছিল? কংগ্রেস তো ৫০ বছর শাসন করেছে। তারা কেন তা আইনের অঙ্গীভূত করেনি? বিরোধীরা কৃষিবিলকে রাজনৈতিক ইস্যু করেছে, যেহেতু এই বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনার আর কোনো জায়গা নেই তাই। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সবসময় ভারত সরকারের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল এবং আগামীদিনেও থাকবে। নতুন আইনে কৃষক দেশ জুড়ে যে কোনো কৃষিজ পণ্য বিক্রি করতে পারতেন। এই আইন কৃষককে পণ্য বিক্রির সুযোগ বাড়াতে সহায়তা দিত। মান্ডি বা কৃষি-বাজারে যেভাবে কৃষকেরা আর্থিক ভাবে শোষিত হয়, মানসিকভাবে প্রতারিত হয়, তা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করত এই আইন।

আন্দোলনকারীরা ছিলেন নাছোড়। সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বারে বারে কথা বললেও, তারা সমাধান চাননি। দেশে আন্দোলনের নামে অস্থিরতা তৈরি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছে। যে দাবিমঞ্চে খালিস্তানপন্থী, নকশালবাদী, উগ্র কাশ্মীরি, শাহিনবাগ ও ভারত বিরোধী মুসলমান নেতাদের দেখা যায়, সেই আন্দোলন আসলে কী! যে আন্দোলন চলাকালীন স্লোগান ওঠে— 'মোদী তেরি কবর খুদেগী, আজ নেহি তো কাল, 'ইন্দিরাকো ঠোক দিয়া, মোদী কেয়া হ্যায়!' 'পাকিস্তান হামারা দুশমন নেহি হ্যায় দিল্লি হামারা দুশমন হ্যায়' 'কৃষি বিল ইজ অ্যান্টি শিখ' সেখানে যাবতীয় আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয় বইকী। কৃষিবিল নিয়ে এই কট্টর বিরোধিতা কেনই-বা কেবলমাত্র পঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মতো স্থানে জন্ম নিল! কেনই-বা অবশিষ্ট ভারতে তার প্রভাব নেই? যে অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন করলেন, সেই রাজ্যের কৃষকের গড় পারিবারিক আয় অন্য রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশি।

রাজ্যের কৃষকের মূল ছবি :

এদিকে এ রাজ্যে ৯৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি নিজেদের মাথার

ঘাম পায়ে ফেলে খাদ্য উৎপাদন করলেও, তাদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় মোটে আটচল্লিশ হাজার টাকা। ভারতীয় কৃষকের গড় আয় আটাত্তর হাজার টাকাও পশ্চিমবঙ্গের চাইতে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের আয় ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের চাইতে কম। রাজ্যে ফসল কাটার পর ব্যবস্থাপনার বিস্তর অভাব আছে, বিপণনের পরিকাঠামোগত সুযোগ নগণ্য। কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে, যদি নতুন কৃষি আইন দ্রুত চালু করে ফসলের সুনিশ্চিত দাম পাইয়ে দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে রাজ্যের কৃষি ও আনুষঙ্গিক বিভাগগুলিকে সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে কাজ করানো যায়। ফসল-প্রাণীসম্পদ-মৎস্য ভিত্তিক চিরায়ত কৃষিকর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। হাজার হাজার ফার্মাস প্রডিউসিং অর্গানাইজেশন তৈরি হলে কৃষকদের একত্রিত করে ফসলের দাম পেতে দর কষাকষি সম্ভব হতো। এফপিও তৈরি করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই কাজটিই করতে চলেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য মোচন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধন তখনই হবে, যখন ফসলের বাজার তৈরি করা যাবে, ফসলের দাম পাওয়ার ব্যবস্থা হবে, ফসল লাগানোর সময়েই চুক্তিচাষে নিশ্চিত হওয়া যাবে কতটা মূল্য সে পেতে পারে। কৃষি আইনে সে সুযোগ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজের পরিচয় গ্রহণ করে নেওয়া যাক। এ রাজ্যের বড়ো অংশের মানুষের জীবনপথ হচ্ছে কৃষিকর্ম। খাদ্যোৎপাদন ও জীবনচর্যায় কৃষিই তাদের আশা, চাষাবাদই তাদের ভরসা। জমির মালিকানা আছে এমন কৃষকের পাশাপাশি গ্রামের হাজার হাজার ভূমিহীন-শ্রমিক কৃষিকাজকে জীবন ও জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছেন। জমির পরিমাণ এক হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘার কম এমন কৃষক রয়েছেন ৮২.১৬ শতাংশ, যাদের বলা হচ্ছে প্রান্তিকচাষি। ৫২.৪৭ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য জমি-জিরেতের মালিকানা তাদেরই হাতে। ১৩.৭৬ শতাংশ কৃষক মোটের উপর ক্ষুদ্রচাষি। তাদের মাথাপিছু জমির গড় পরিমাণ এক থেকে দুই হেক্টর। এরা রাজ্যের মোট চাষযোগ্য কৃষিজমির ২৮.২৫ শতাংশ দখল করে আছে। সবমিলিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ৯৫.৯২ শতাংশ, তারা মোট ৮১ শতাংশ কৃষিজমির মালিক। ২০১০-১১ সালের জনগণনা অনুসারে ৭২ লক্ষ কৃষক পরিবার এ রাজ্যে বসবাস করেন। ধীরে ধীরে তাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমছে এবং চাষ থেকে আয়ের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। রাজ্যের শস্য নিবিড়তা ১৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্যে গড়পড়তায় দুটি ফসলও চাষ হয় না। সেচের সুবিধাযুক্ত কৃষিভূমি মাত্র ৫৪ শতাংশ। শতাংশের উপর কৃষক পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৪ লক্ষ টাকার বেশি। রাজ্যের একটি বড়ো এলাকা খরাপ্রবণ পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানে ভূমিক্ষয় বড়ো সমস্যা। মাটির উর্বরা শক্তি একেবারেই কম। বৃষ্টিপাত কম এবং অনিশ্চিত। এদিকে সুন্দরবন একটি পশ্চাৎপদ ব-দ্বীপ এলাকা। সেখানে সতেজ ও বিশুদ্ধ জলে সেচ দেওয়া মুশকিল। পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলের মাটি ক্ষয়িষ্ণু ও অম্লধর্মী। তার উৎপাদিকা শক্তি কম। সেচের সুবিধা অপ্রতুল। ফলে এইসব অঞ্চলে প্রতিকূলতার জন্য দশকের পর দশক কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষককে খাদ্যের নিশ্চয়তা এবং জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দেওয়া এক প্রবল সমস্যা। কেন্দ্রের বিকাশধর্মী রথের চলায় পশ্চিমবঙ্গ যদি সাড়া না দেয়, তবে রাজ্য সরকার বদল করা প্রয়োজন।

চব্বিশে সোনার ভারত আর রাজা নরেন্দ্র কেন চাই :

এবার ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আবহে চিত্রকল্পটি স্মরণ করুন। এক সন্ততুল্য রাষ্ট্রনায়ক উন্নয়নের দিগ্‌বিজয়ের রথ নিয়ে বিশ্বজয় করে রাজ্যে রাজ্যে প্রবেশ করছেন। উন্নয়নহীন 'বিশ্ববাংলা'য় এসে ১০০ দিনের ভিক্ষা পাওয়া বাঙ্গালি, চালের ভিক্ষার ঝুলি ভরানো বাঙ্গালি, পরিযায়ী শ্রমক্লিষ্ট বাঙ্গালি চালচোরেদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উন্নয়ন না করে বাংলার শাসক ভিখারি বানানোর তোড়জোড় করেছে। রাজ্যে শিক্ষা নেই, উন্নয়ন নেই, কর্মসংস্থান নেই, শিক্ষান্তে চাকরি নেই, শিল্প নেই, সংস্কৃতি নেই, ঘুষের দামে মেধার মূল্য নেই। বেকারি, বেরোজগারের অন্ধ ভিখারিরা চারিদিকে গিজগিজ করে বেড়াচ্ছে। চোখে 'জয় বাংলা' হয়েছে মানুষের। আক্রান্ত চোখে সত্যকে দেখতে না পেয়ে ন্যাবা রোগ ধরেছে রাজ্যকে। ঘুষপেটি রোহিঙ্গার দল আগাছার মতো ঢুকেছে মালঞ্চে। কুসুমোদ্যানে অবৈধ অনুপ্রবেশে ছারখার বঙ্গভূমি। চারিদিকে ভয়ানক জতুগৃহ, ফতোয়ার ফন্দি।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, দেগঙ্গা, উস্থি, মন্দিরবাজার, কালিয়াচক, জুরানপুর, হাজিনগর, ধুলাগড় অসংখ্য নাম। মা-বোনেদের লাঞ্ছনা। রাজ্যের মানুষ অজানার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এমনই ভিক্ষালব্ধ ধনে প্রতিপালিত হতে বাধ্য হওয়া চারিদিকে ভিখারি-নাগরিক। বাঙ্গলার ভিখারি ভাবছে, ভরতুকির স্বর্ণরৌপ্য মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেবেন গোল্ডেন চ্যারিওটের সেই দেবতা নরেন্দ্র। 'স্টিকার দিদি' বাঙ্গলার নামে নিজের লেবেল বসিয়ে কাউকে কাউকে উপঢৌকন দেবেন। ভিখারি বিনা আয়েসে, খেলা-মেলার সরকারের দাক্ষিণ্য কুড়িয়ে নেবে বঙ্গভূমে বসেই। কিন্তু না! সেই ঐশীরথ ভিখারির পাশে এসে থেমে গেল। সাধু নামলেন। বিশ্ববরেণ্য নেতার পদে আসীন তিনি। সাংগঠনিক শক্তির অপরূপ সৌকর্য, মনের সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে। রাজভিখারি নরেন্দ্র এসে বাঙ্গলার বোধ হারানো, বিবেক হারানো, বিকিয়ে যাওয়া মনের কাছে ভিক্ষা চাইলেন। দেশ গড়ার ভিক্ষা, উন্নয়নের যজ্ঞ সংঘটিত করার ভিক্ষা। অন্যায় অবিচার দূর করার ভিক্ষা। অন্যায় অবিচার দূর করার ভিক্ষা। অপশাসন দূর করার ভিক্ষা।

এটাই কি ভোট ভিক্ষা! যদি মনে করেন সমগ্র দেশের সঙ্গে বাঙ্গলাকেও রিকনস্ট্রাকশন করার ভিক্ষা, তবে তাই! যদি মনে করেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বাঙ্গালি প্রজাতির দিল্লি যাত্রার শুল্ক, তবে তাই! অন্তরকে পুরোপুরি দান না করলে সোনার ভারত হবে না। সোনার বাঙ্গলাও হবে না। অন্তর উজাড় করে সবটুকু দিতে না পারলে দেশ সোনার হয় না। 'জয় বাংলা'র জীবাণুতে আক্রান্ত চোখ নিয়ে এই ভিক্ষার সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ধরতে পারবো না। বুঝতে পারবো না স্বর্ণবঙ্গ করে দেবার জন্যই আমার কাছে হাত পেতেছেন ভারত-সম্রাট। ২০২১-এ আমরা ভিক্ষা দিইনি। তার ফল আমরা হাতে গরম পেয়েছি। ক্ষণিকের দ্বিধায়, কুড়ি টাকার পাউচের নেশায়, ৫০০ টাকার ভিক্ষাশ্রীতে, ভোটপর্বের ডিভ্রাতে যদি আকুল হই, তবে ভুল হয়ে যাবে আমার জীবন, আমার পরবর্তী প্রজন্ম, আমার উত্তরাধিকার, আমার ঐতিহ্য, আমার লোকসংস্কৃতি।

তাই চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, গোরুচুরির রাজ্যে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে সমস্ত ভিক্ষাকণাগুলি অর্থাৎ আমাদের মতদানগুলি সোনা করে নেবার সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো না। সরকার গড়তে দিল্লিগামী-শকটে আমার সাংসদ, আমার সামর্থ্য, আমার অন্তরাত্মা, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার শক্তি যোগদান করবে ভারত-নির্মাণে। আর এটাই হবে প্রকৃত 'যোগদান মেলা'। রাজা নরেন্দ্র উন্নয়নের এক নাম।

ভামাশাহের ত্যাগ

লক্ষ লক্ষ মুঘল সেনা চিতোড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মরণপণ লড়াই করেও রাজপুত যোদ্ধারা চিতোড় রক্ষা করতে পারলেন না। মহারাণা প্রতাপ মুষ্টিমেয় সৈনিকের সঙ্গে পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে আরাবল্লী পর্বতের বনে বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর একটাই চিন্তা কীভাবে আবার চিতোড় উদ্ধার করা যায়। এদিকে খিদের জ্বালায় তাঁর ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা কাতর হয়ে পড়েছে। কয়েক দিন পর তাঁর দুজন সৈন্য একটুখানি ঘাসের বীজ সংগ্রহ করে আনল। তাই দিয়ে কয়েকখানা রুটি তৈরি করে রাখতেই একটা বনবিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাও নিয়ে পালিয়ে গেল। তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন।

অনুগত সৈনিকদের ডেকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও। এভাবে আর বেঁচে থাকা থাকা সম্ভব নয়। আমার যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। ভীল সর্দারদের অনেক কষ্টে রাজি করালেন। এমন সময় মহারাণার এক সময়ের বন্ধু ভামাশাহ তাঁর সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে মহারাণার পায়ে পড়ে বললেন, মহারাণা, আমাদের অনাথ করে আপনি চলে যাবেন না। মহারাণা ভামাশাহকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মিত্র, আজ

ভাগ্য আমার সঙ্গে নেই। তাই এখানে থেকে আর কী লাভ হবে? এজন্য আমি জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও চলে যাচ্ছি, যদি কোনোদিন আবার টাকাপয়সা হাতে আসে তখন সৈন্য সংগ্রহ করে চিতোড় উদ্ধার করব। আপনারা এখন ধৈর্য ধরে বাড়ি ফিরে যান।

ভামা শাহ হাত জোড় করে বললেন, মহারাণা, আমি সারাজীবন যে ধনসম্পদ রোজগার করেছি, তা আমার নিজের জন্য নয়। তা এই মাতৃভূমির জন্য। আমি আমার সারাজীবনের সঞ্চয় আজ আপনাকে দিতে এসেছি মহারাজ।

তারপর ভামাশাহ ইশারা করতেই জঙ্গল থেকে দশজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল। সবগুলি ঘোড়ার পিঠে আশরফি ভর্তি বড়ো বড়ো থলে। দশজন ঘোড়সওয়ার থলেগুলি মহারাণার পায়ের কাছে রাখল। ভামা শাহ বললেন, মহারাণা, আমি ও আমার বাপ-ঠাকুরদা চিতোড় রাজদরবারের কৃপাতেই এইসব ধনসম্পদের মালিক হয়েছি। আপনি দয়া করে এগুলি গ্রহণ করুন। আবার সৈন্য সংগ্রহ করে মাতৃভূমি উদ্ধার করুন।

মহারাণা ভামাশাহকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, লোকে রাণা প্রতাপ সিংহকে দেশ উদ্ধারক বলে, কিন্তু এই পবিত্র মাতৃভূমির উদ্ধার তো তোমার মতো দানবীরের সাহায্যেই হবে।

মহারাণা আবার সৈন্য সংগ্রহ করে মাতৃভূমির অধিকাংশ এলাকা পুনরুদ্ধার করে উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁর নেতৃত্বে রাজপুত যোদ্ধারা আবার স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

রাণা প্রতাপকে রাজপুত ইতিহাসে স্বাধীনতার পূজারি বলা হলেও ভামাশাহকে স্বাধীনতার প্রধান সেবক রূপে উল্লেখ করা হচ্ছে। রাজপুত ইতিহাসে ভামাশাহের ত্যাগের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

শিবানী সিংহ

বীর বনবাসী

ডেলন শাহ

মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর পরগনার মদনপুরে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোণ্ড জনজাতির মানুষ ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ইংরেজদের চৌরাগড় দুর্গ আক্রমণ করে ইউনিয়ন জ্যাক তুলে ফেলে দিয়েছিলেন। পরে আবার একবার আক্রমণ করে বেশ কয়েকটি এলাকা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তিনি ও তাঁর পুরো পরিবার শেষ হয়ে যায়। এক সময় যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। ১৮৫৮ সালের ১৬ মে তাঁকে দিলবার দুর্গের পেছনের বটগাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

জানো কি?

- ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিশ্রণে সিমেন্ট তৈরি হয়।
- হলুদ ও নীল রঙের মিশ্রণে সবুজ রং সৃষ্টি হয়।
- প্লাস্টার অব মর্টার চুনের জল থেকে তৈরি করা হয়।
- বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতির কারণে তামা-পেতলের রং বিবর্ণ হয়ে যায়।
- মানব শরীরের লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় অস্থিমজ্জায়।
- সাপের বিষ আসলে প্রোটিন।

ভালো কথা

কাঠবেড়ালি

আমাদের বাড়ির বসার ঘরের কুলুঙ্গিতে দুটো কাঠবেড়ালি খড়কুটো দিয়ে একেবারে পাখির মতো বাসা তৈরি করেছিল। কয়েকদিন পরে চিঁচিঁ শব্দ শুনেতে পেয়ে দেখি দুটো ছানা হয়েছে। লাল টুকটুকে। পনেরোদিন পরে দেখি ওদের মা-বাবা ছানাদুটোকে নিয়ে বারান্দায় নেমে খেলে বেড়াচ্ছে। মা কয়েকটা চিনাবাদাম ছড়িয়ে দিতেই ওদের মা-বাবা মুখে নিয়ে চিবিয়ে ছানাদুটোকে খাইয়ে দিতে লাগল। কদিন পরে ছানাদুটো নিজেরাই খেতে শিখে গেল। এখন চারটে কাঠবেড়ালিই মায়ের হাত থেকেই খাবার নিয়ে খায়। কাউকেও ভয় করে না। ওরা এখন আমাদের বাড়ির সদস্য হয়ে গেছে।

সীমা সিংহ, নবম শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ক র্মা ত রি

(২) ম রু ক য়ী

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র হ স বা চ ল্য আ

(২) ন পা ল জ ক বা অ

২৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) হিতোপদেশ (২) ভারতমাতা

২৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) হৃদয়বিদারক (২) হর্তাকর্তাবিধাতা

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, ইংলিশ বাজার, মালদা। (২) যাজ্ঞশ্রী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

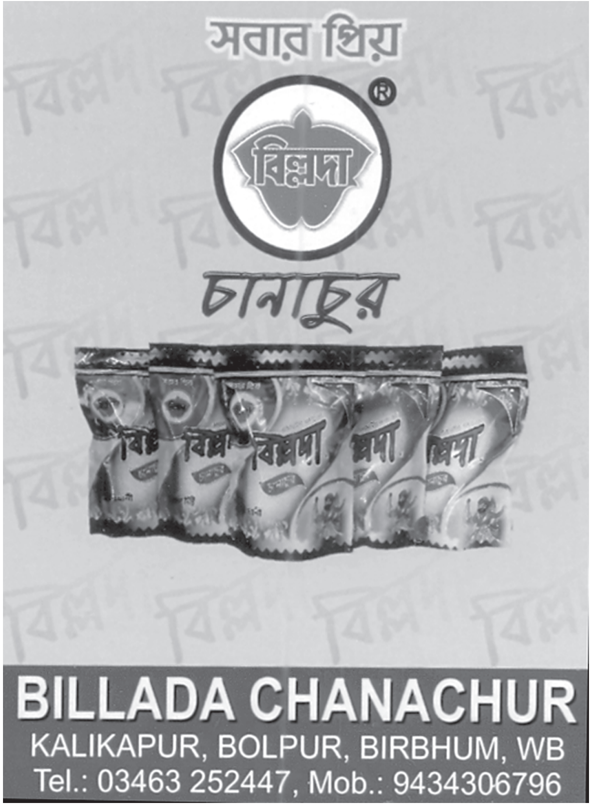

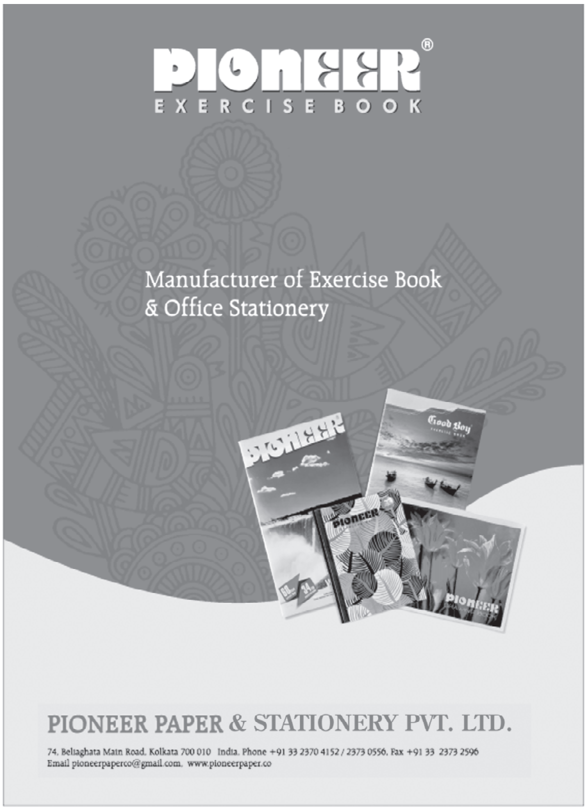

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মোদী সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য

চুরি যাওয়া প্রত্নসম্পদ ভারতে ফেরাবে আমেরিকা

সাম্প্রতিকতম মার্কিন সফরে ভারতের সেরা প্রাপ্তি কী? কূটনৈতিক সাফল্যের খতিয়ান তো মোদী ক্ষমতায় আসার পর সহজলভ্য হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জুনের আমেরিকা-সফরেও তার ব্যতিক্রম হলো না। এবং এই কূটনৈতিক সাফল্যের হাত ধরেই ভারতে ফিরতে চলছে এদেশ থেকে একদা চুরি যাওয়া বহু দুষ্প্রাপ্য পুরাকীর্তি। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, আমেরিকা ভারত থেকে চুরি যাওয়া ৩০৭টি পুরাকীর্তি ফিরিয়ে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই পুরাকীর্তিগুলি ভারত থেকে চুরি হয় সাম্প্রতিক অতীতে। যেগুলির বাজার মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ ডলার। তিন দিন ব্যাপী আমেরিকা সফরের শেষ দিনে ২৩ জুন মোদীর রোনাল্ড রেগান সেন্টারে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মেলনে একাধিক ঘোষণার মধ্যে অন্যতম ছিল, মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা ভারতের ১০০টিরও বেশি প্রাচীন সম্পদ, যা চুরি হয়ে আমেরিকায় এসেছিল, তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমি খুব খুশি যে মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারতের একশোটিরও বেশি পুরনো সামগ্রী যা চুরি হয়েছিল তা ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বেঠিক রাস্তা ধরে এই পুরনো সামগ্রীগুলি আন্তর্জাতিক বাজার অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। তা ভারতে ফেরানোয় উদ্যোগে নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমেরিকা সরকারকে'। তিনি দুই দেশের মধ্যে 'আবেগের সংযোগ' তুলে ধরে আরও বলেন এই পুরাকীর্তিগুলি ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে আনন্দ দেবে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, চুরি যাওয়া পুরাসম্পদ ফিরে পেয়ে ভারত যে অত্যন্ত আপ্লুত, আমেরিকার সিদ্ধান্তই প্রমাণ করলো তাদের সঙ্গে ভারতের আবেগের একটা সম্পর্ক রয়েছে। যা কূটনৈতিক দিক থেকে আগামীদিনে আরও কিছুটা গাঢ় হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। চুরি যাওয়া প্রত্নবস্তু ভারতে ফেরাতে আমেরিকার এহেন উদ্যোগ অবশ্য নতুন নয়। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সফল কূটনৈতিক দৌত্য এ ব্যাপারে বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ভারত থেকে চুরি যাওয়া বহু দুষ্প্রাপ্য প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর মধ্যে ২৫১টি বস্তু ইতিমধ্যেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার মধ্যে ২৩৮টি বস্তুই ২০১৪ সালের পর দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২০২২ সালেও মার্কিন প্রশাসন ৩০৭টি চুরি যাওয়া দুষ্প্রাপ্য বস্তু ভারতকে ফিরিয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'বহু দশক ধরে বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, যার অধিকাংশেরই গভীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে, তা চুরি হয়ে গিয়েছে এবং বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের তরফে এই সমস্ত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

২০২১ সালে অক্টোবর নাগাদ আনুমানিক ১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ১৭৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ভারতে ফিরিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্কে ভারতীয় কনস্যুলেটে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এগুলি হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটি ব্রোঞ্জ শিব নটরাজ মূর্তি, যার মূল্য প্রায় চার মিলিয়ন ডলার। তখনই জানা গিয়েছিল যে, পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক শিল্পকর্মের চুরি, বেআইনি বাণিজ্য ও পাচার নিয়ে একটি তদন্ত শুরু করেছে আমেরিকা। সেই তদন্ত করতে গিয়েই ভারত থেকে চুরি হওয়া একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমেরিকা-ইউরোপের দেশগুলি জাদুঘর এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় এমন বহু দ্রব্য আছে যা আদতে ভারতের সম্পত্তি।

বেআইনিভাবে তা সংগ্রহ করলে মার্কিন সরকার বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থা করছে। এখনও পর্যন্ত আমেরিকয় পাচার হয়ে যাওয়া ১৫৭টি শিল্পকর্ম ভারতকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব-পার্বতী এবং ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি, দু'হাজার বছর আগের টেরাকোটার কাজের ফুলদানি, একাদশ শতাব্দীর নানা ঐতিহাসিক সামগ্রীও রয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, আর্ট স্মাগলার সুভাষ কাপুর ভারতে বন্দি হলেও নিউইয়র্কে তার আর্টস অব দ্য পাস্ট গ্যালরিতে হানা দিয়ে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে লুণ্ঠিত একাধিক দুর্মূল্য শিল্পকর্ম উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে শিবের নটরাজ মূর্তিটি উদ্ধার হয়েছে ন্যান্সি ওয়েনারের কাছ থেকে। তাঁর বিরুদ্ধেও পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্পদ সংরক্ষণে বিশেষ নজর দিয়েছে, যাতে দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের স্ফুরণ ঘটে। চুরি যাওয়া পুরাসম্পদ উদ্ধারের প্রক্রিয়া তারই অঙ্গ বলে পুরাতাত্ত্বিকরা মনে করছেন। ঠিক যেভাবে কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের দখলে থাকা কোহিনূর হীরে উদ্ধারে মনোযোগ দিয়েছিল ভারত। মোদী সরকারের কূটনীতিই এক্ষেত্রে ভরসা। □

গ্রাম উন্নয়নে গো-সম্পদ সুরক্ষা

ড. অনিল কুমার ঘোষ

গো-সম্পদের গুরুত্ব ভারতবর্ষের মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই উপলব্ধি করে আসছে। মেহেরগড় সভ্যতার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় ৯০০০ বছর আগে। ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস জারিজ ১৯৭০-এর দশকে অনুসন্ধানের শেষে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, পশুপালন ও কৃষিকাজ ছিল এই সভ্যতার অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কাজ। পশুপালনে তারা যে গাভী পালন করত তা ছিল স্থানীয় জেবু গাভী, যা অনেকটাই বশিষ্ঠ মুনির কামধেনুর যে ছবি আমরা দেখি, অনেকটাই সেইরকম আকৃতির। দেশি গাভী হিসেবে জেবু গাভীর কার্যকারিতা যে অনেক বেশি সেকথা গো-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে থাকেন। মেহেরগড় সভ্যতার উৎপত্তি স্থানীয় মানুষদের দ্বারাই গঠিত এক সভ্যতা— একথাও প্রত্নতত্ত্ববিদ উল্লেখ করেছেন। সভ্যতার গঠনে এবং প্রসারে যে স্থানীয় পশু হিসেবে জেবু গাভীর গুরুত্ব ছিল সে কথা ওশকো পারপোলার মতো লেখকেরাও স্বীকার করেন। প্রায় সমসাময়িক কালের সভ্যতার ইতিহাস হলো রামায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে গোরক্ষার গুরুত্ব উল্লেখিত আছে। 'কচ্চিদে দয়িতা সর্বে কৃষি গোরক্ষ জীবিনঃ। বার্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকো হি সুখমেধতে।।' (২-১০০-৪৭)। ভাই ভরতকে রাজ্য শাসন বিষয়ে পরামর্শ দেবার সময়ে দাদা শ্রীরাম বলেন— 'যারা কৃষি ও গোরক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সঙ্গে তুমি প্রিয় আচরণ করবে। মনে রেখো জগতের উন্নতি গোপালন থেকেই হয়ে থাকে। এথেকে বোঝা যায় গোরক্ষাকে কতখানি গুরুত্ব সে যুগে দেওয়া হতো। সিন্ধু সভ্যতার অন্দরেও আমরা বলদের প্রতিকৃতি দেখতে পাই। মহাভারতের যুগে গো-সম্পদের গুরুত্ব বুঝি বিরাট রাজার গোধন সম্পর্কে উল্লেখ থেকে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ছিল গোচারণভূমি। গৌতমবুদ্ধ গাভীকে মানুষের পরম মিত্র বলেছেন। সুজাতার হাতে গোদুগ্ধের ক্ষীর খেয়েই তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন। দয়ানন্দ মানতেন যে এক গাভী তার জীবনকালে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ জন মানুষের একবেলার ভোজন জুটাতে পারে অথচ তার মাংস খেয়ে মাত্র ৮০ জন লোক তাদের পেট ভরাতে সক্ষম হয়। গান্ধীজী বলেন— গোবংশের রক্ষা ঈশ্বরের সকল মূক সৃষ্টিকে রক্ষা করার সমান।

প্রাচীনকাল থেকে গো- সম্পদের এতখানি গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগে মুসলমানদের শাসনকাল থেকে গোমাংস ভক্ষণের একটা ঝোঁক তৈরি হয়। গোহত্যার সূত্রপাত ইসলামি অনুগামীদের ভারতে আগমনের পর থেকেই। কোরানে গোহত্যা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে মুসলমান সুলতানেরা গোহত্যার বিরুদ্ধে ফরমান জারি করতে থাকল তাতেও কিন্তু গোহত্যা রোখা যায়নি। এর পরে ইংরেজ ও ডাচেরা এল, তারা চামড়া রপ্তানি করার জন্য পশু হত্যা চালিয়ে যেতে থাকল। এজন্যে তারা কসাইখানা স্থাপনও করেছিল। ১৮৫৭ সালে গোরুর চর্বি যুক্ত কার্তুজ ব্যবহারের কারণে সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠেছিল, যা আমরা মহাবিদ্রোহের কারণ বলে জানি। অনেক গোভক্ত গোহত্যা রোধে যুদ্ধ করে বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৮৭২ সালে কাতারপুরে মরেকোটলাতে কুকা নামে এক গোরক্ষকের বলিদান হয়। সদগুরু শ্রীরামসিংজী মহারাজকে গ্রেপ্তার করে রেঙ্গুনে কারাগারে রাখা হলো। ১৯১৮ সালে কাতারপুরে গোহত্যার কারণে দাঙ্গা হলে যেখানে অনেক গোভক্ত মারা গেলেন। শুধুমাত্র মুসলমান বা ইংরেজ আমলেই নয়, স্বাধীন ভারতেও গোহত্যা এবং তার কারণে দাঙ্গা ঘটেছে এবং বহু গোভক্ত মৃত্যুবরণ করেছেন।

বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, মদনমোহন মালব্যের মতো বরেণ্য নেতারা গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিলক বললেন স্বাধীনতার চেয়ে গো-হত্যা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন। গান্ধীজী গোরক্ষা আন্দোলনকে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তিনিও স্বরাজের চেয়ে গোরক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মুসলমান তুষ্টিকরণ নীতি সর্বদই তাঁকে একাজে বাধাদান করত। যে কারণে ১৯২০ সালে নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে ডাক্তারজীকে গোরক্ষার প্রস্তাব পেশ করতেই দিলেন না। ডা হেডগেওয়ার গোরক্ষার একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। এই ইসলামি তুষ্টিকরণ নীতি এবং ভোটব্যাংক রাজনীতির কারণে স্বাধীন ভারতের প্রারম্ভিক সরকার কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পারেননি। এ বিষয়ে নেহরু-নীতি ছিল দ্বিমুখী প্রথম বছরে তিনি গোরক্ষার জন্য দাতারাম

সমিতি বানালেন। সমিতির পরামর্শমতো সংবিধানের ৪৮নং অনুচ্ছেদে গোরক্ষা, গোসংবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে গোহত্যা বন্ধ করার কথাও যুক্ত করলেন কিন্তু এবিষয়ে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব রাজ্যের উপরে ছেড়ে দিলেন। এই দুমুখো নীতির কারণে করপাত্রী মহারাজের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহে হাজারো গো-ভক্ত কারাগারে বন্দি হলেন। এই আন্দোলনে সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রায় দু কোটি প্রবীণ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এবং রামলীলা ময়দানে তাদের নাতিদের নিয়ে এক শোভাযাত্রা ও সমাবেশ করে, যেখানে সদ্‌গুরু প্রতাপ সিংজী মহারাজ, নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো নেতৃত্ব বক্তৃতা করেন। ১৯৫২ সালের ৮ ডিসেম্বর এই স্বাক্ষরপত্র-সহ দাবিপত্র পেশ করা হয় তৎকালীন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে; নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীগুরুজী এবং লালা হংসরাজজী।

এভাবেই এগিয়ে চলল গোরক্ষা আন্দোলন। হিন্দু ধর্মাচার্যরা উপলব্ধি করলেন যে বিশ্বের হিন্দুদের আস্থাকেন্দ্র হিসেবে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করা হোক এবং বিশ্ব কল্যাণে ভারত সেই দায়িত্ব পালন করুক। এই লক্ষ্যে অবিচল থেকে মুম্বাইয়ের সন্দীপন সাধনালয়ে স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর পৌরহিত্যে ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট জন্মাষ্টমী তিথিতে গঠিত হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উপস্থিত ছিলেন মাস্টার তারা সিংহ, জ্ঞানী ভূপেন্দ্র সিংহ, ডাঃ জে এম মুন্সী, শ্রীগুরুজী, স্বামী শঙ্করানন্দ সরস্বতী, সন্ত তুকড়ীজী মহারাজ, বি জি দেশপাণ্ডে, ব্যারিস্টার এইচ জি আদবানী, পদ্মশ্রী কে কে শাস্ত্রী-সহ অনেকে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম অধিবেশনে প্রয়াগে গোরক্ষা বিষয়ে এবং গোহত্যা বন্ধ কানুন তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করা হলো। এই সম্মেলনেই গোপাষ্টমীর দিন ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ সালে গোরক্ষা দিবস পালনের প্রস্তাব নেওয়া হয়।

এরপর থেকে গো-সুরক্ষার আন্দোলনের দিনগুলি আরও কঠোর হতে থাকল, কারণ পরোক্ষ সহায়তা পেতে থাকল কেন্দ্রের সরকার এবং বেশ কিছু রাজ্য সরকারের থেকে। সংসদ ভবন অভিযান ১৯৬৬ সালে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নিরঞ্জন দেবতীর্থ এবং প্রভুদত্তজী ব্রহ্মচারীর আমরণ অনশন, শ্রীগুরুজীর হস্তক্ষেপে তা নিরসন ইত্যাদি অনেক কঠিন কঠিন অবস্থা থেকে স্বয়ংসেবকেরা চলেছেন এবং আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে গেছেন। গোরক্ষার পাশাপাশি গোসেবা অভিযানও চলতে থাকল। গোসেবা মহাভিযানের সংযোজক ছিলেন রাধাকৃষ্ণ বাজাজ এবং সহ-সংযোজক ছিলেন অশোক সিংহলজী। ১৯৮৮ সালে কলকাতার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গোপালকদের নিয়ে ২৪-২৫ ডিসেম্বর দু'দিনের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৯০ সালে মধ্যপ্রদেশে গোহত্যা বন্ধের সংকল্প নেওয়া হলো। বিভিন্ন প্রদেশে গোশালা স্থাপিত হতে থাকল যেখানে যত্ন সহকারে বিভিন্ন অবস্থার গোসম্পদের সুরক্ষার এবং সেবার ব্যবস্থা করা হলো। ১৯৯৬ সালে ২১ জানুয়ারি প্রয়াগে মাঘ মেলার সময়ে পতিতপাবনী গঙ্গার তীরে বজরং দল ভারতের যুব শক্তিকে আহ্বান জানাল এবং লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত প্রায় এক লক্ষ যুবা সমন্বিত এই ঐতিহাসিক র‍্যালিতে সন্ত এবং ধর্মাচার্যদের সান্নিধ্যে যুবকেরা গোবংশ রক্ষার সংকল্প নিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে গোরক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গোবংশ হত্যা এবং মাংস রপ্তানির উপরে প্রতিবন্ধের অভিযানও পরিষদের তত্ত্বাবধানে চলবে।

১৯৯৮ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 'গোসম্পদা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করল যা আজও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার মৌড়ীগ্রামের নিকট এক আল কবির কল্লাখানা ফুড প্রসেসিং শিল্প গড়ে গোহত্যা চলছিল তা বন্ধ করতে স্বয়ংসেবকেরা যথেষ্ট কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আন্দুলের রাজবাড়ি ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল সমাবেশ ঘটেছিল। জনবিক্ষোভে সরকারের টনক নড়ল এবং সেই কসাইখানা বন্ধ করার নির্দেশ এল। এইভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোহত্যা বন্ধে এবং গোরক্ষা এবং গোসেবার অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন স্বয়ংসেবকেরা। ১৯৭১ সালে কলকাতার পিঞ্জরাপোল সোসাইটির গঠন হলো উদ্দেশ্য হলো সক্ষম ও বৃদ্ধ গোসম্পদ এবং দুধেলা গাইকে আমৃত্যু সেবা করা। এক সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে দেশে মোটামুটি ১৯ কোটি গোবংশ জীবিত আছে। বৃদ্ধ বয়সে গোরুকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয় তার শ্রম বা মূল্য দেবার ক্ষমতা থাকে না বলে। এ ধরনের মালিকানাহীন গোরুদেরকেও গোসেবা কেন্দ্রগুলিতে পোষণ করা হয়। ভারতের জীবজন্তু কল্যাণ বোর্ডের তথ্যানুসারে একটি বৃদ্ধ গোরু প্রতি বছর ৪৫০০ লিটার বায়োগ্যাস, ৮০ টন জৈবিক সার এবং ২০০ লিটার জৈবিক কীট নিবারকের জোগান দিয়ে থাকে। একসঙ্গে এদের মূল্য ১৯৮৯ সালে ছিল ১৭,৮৮৫ টাকা এবং ১৯৯৮ সালে তা ছিল ২৫, ০০০ টাকা, আজকের দিনে সেই মূল্য কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

গো-সম্পদের অবদান দু' এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না তবু কিছু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানবজীবনে গোসম্পদ একদিকে যেমন কৃষি ক্ষেত্রে জৈবসার ও কীটনাশকের জোগান দিয়ে থাকে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের দৈহিক রোগ অসুখ নিরাময়ে প্রভূত পরিমাণে ওষধির জোগান দিয়ে থাকে। তা একদিকে যেমন সহজলভ্য ওষুধ পাওয়া সম্ভব হয়, তেমনি সুলভে তা সংগ্রহ করা যায়। পারিবারিক অর্থনীতিতে তা গ্রহণযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এবিষয়ে নানা স্থানে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিজ্ঞানীরা নিয়মিত গবেষণা করে চলেছেন। বরিষ্ঠজনদের প্রেরণা থেকে গোবিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্র নাগপুরের কাছে দেওলাপারে ১৯৯৬ সালের ১৫ অক্টোবর সমতুল বিজ্ঞান কেন্দ্র গঠিত হলো, শ্যামবল্লাল এই কাজে তাড়াতাড়ি রূপ প্রদান করলেন। কসাইদের হাত থেকে গোবংশ ছাড়িয়ে এনে এখানে বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসের স্থানে রেখে তাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা হলো। স্থাপনার পরে ১৯৯৭ সালে পঞ্চগব্য আয়ুর্বেদ ওষুধের দেশ হিসেবে এই সংস্থা প্রথম লাইসেন্স প্রাপ্ত হলো। এধরনের আরও একটি গোসেবা সংস্থা গড়ে উঠল রাজস্থানে গাড়েরবালাতে যার নামকরণ হলো পরম গোভক্ত সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক গুরুজীর নামে মাধব গো-বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্র। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতে প্রতিদিন গড়ে প্রতি ব্যক্তির ১৩ আউন্স দুধ পান করা আবশ্যক, সেখানে আমাদের দেশে গড় প্রাপ্তি মাত্র ০১ আউন্স যেখানে আমেরিকা, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে তার পরিমাণ ৫০ আউন্স। গোসেবাকেন্দ্রগুলিকে সুদৃশ্য করে এবং নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে পর্যটনের মতো আকর্ষণীয় করে

তোলা যায়। এ ধরনের অভিমতও বিশেষজ্ঞরা দিয়ে থাকেন। গোশালাগুলিকে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে সম্প্রসারিত উন্নয়ন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

গ্রামরক্ষা এবং উন্নয়নের বিষয়টিও গোরক্ষা এবং গোসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একটি প্রকল্প। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালে গ্রাম বিকাশের সফল প্রয়োগ রূপে পদ্মশ্রী নানাজী দেশমুখ দ্বারা স্থাপিত হলো দীনদয়াল গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থায় গৃহীত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য স্বয়ংসেবকদের দ্বারা গঠিত সংস্থা অগ্রসর হয়েছে। গ্রামবাসীরা গ্রাম বিকাশের কাজে অংশগ্রহণ করে গ্রামবিকাশের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম নানাজীর সামাজিক কাজ দেখে তাঁকে রাষ্ট্রঋষি বলে সম্বোধিত করেন। ১৯৭৮ সালে নানাজী রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে গ্রাম বিকাশের কাজে মনোনিবেশ করেন। এই দীনদয়াল গবেষণা সংস্থার অন্তর্গত চারটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সঞ্চালিত হতে থাকল। এই সংস্থাগুলি কৃষকদের কাছে আধুনিক উন্নত পদ্ধতির কৃষি ব্যবস্থার তথ্যাদি পৌঁছে দিতে থাকল। গ্রাম উন্নয়ন যোজনার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির উন্নয়নের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় কৃষি বা আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি। গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হবার প্রবণতা রোধ করা আজকের গ্রাম বিকাশের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া দরকার। গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে একট বিপরীত স্রোত তৈরি করা যাবে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মধ্যভারতের ভিণ্ড জেলাতে মেহগাই তহশিলের একটি গ্রাম এক কুপ্রথার কারণে সবদিক থেকে পরিবারগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ছিল, কেউ তাদের সঙ্গে মিশত না, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিকে কেউ নজর দিত না, এরকম পরিস্থিতিতে বিদ্যাভারতী দ্বারা সঞ্চালিত একল বিদ্যালয় গঠন করে তার নানাবিধ মানবিক, সহানুভূতিশীল কাজের মধ্য দিয়ে আজ সেই গোষ্ঠীর মানুষেরা গ্রামে বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়া, চিল্কাপুরে কুষ্ঠি সমাজের সমাজ বিচ্যুত মানুষদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা, গ্রামে সামাজিক সমরসতা তৈরি করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামের সামাজিক ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলাতে সঙ্ঘের শাখা গঠনের কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে চেতনার উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের দিয়ে সরপঞ্চের কাজ করানো, ফলে গ্রামোন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হতে থাকে। জন্মদিন এবং প্রয়াণদিন স্মরণের অভিনব পথ নির্দেশ পাওয়া যায়। জন্মদিনে অন্যভাবে খরচ না করে কিছু চারা গাছ রোপণ করা হলে প্রতিদিন তার পুত্র বা কন্যার কথা মনে রেখে জল দেওয়া, মৃত ব্যক্তির নামে কোনো বৃক্ষ রোপণ করে থাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টাতে তার বাবা মায়ের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদান করা হবে। এই ভাবনা একদিকে বৃক্ষ রোপণ এবং অন্য দিকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় থাকে স্নেহ, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। কোট টাই পরে বৃক্ষ রোপণ নয়, এ এক অন্যরকমের বনায়ন পদ্ধতি।

১৯৭৮ সালে দীনদয়াল গবেষণা সংস্থা যে গোণ্ডা গ্রামোদয় প্রকল্প গ্রহণ করেছিল তা দেশভর বিখ্যাত হয়ে গেল। এরকম হাজার হাজার গ্রামের নানা ধরনের অভাব দূর করে উন্নয়নের ব্যবস্থা করে চলেছে এই গবেষণা সংস্থাগুলি। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন জেলার জয়নগর মহকুমার কুলতলি খণ্ডের পিছাবনি গ্রামে সুদর্শনজীর প্রেরণাতে ২০০৩ সালে ওখানে গ্রাম সমিতি গঠিত হলো। ২৫০টি পরিবারের এই গ্রামে ৯০ শতাংশ পরিবারে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা, শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পশুপালন, শিশু সংস্থা কৃষিতে জৈবিক সারের প্রয়োগ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে গ্রামটিকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন জায়গাতে আনা গেছে। এরকম অসংখ্য পরিমাণে গ্রাম উন্নয়নের কাজ হয়ে চলেছে, যা সম্ভব হয়েছে স্বয়ংসেবকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। □

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ- ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুট এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্‌টিক্যাল (আসন-প্রাণায়াম-মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাজ (যোগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্‌টিস টিচিং।

সময়কাল : ১ বছর। ৩০ জুলাই থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা : ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস : প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট
অব কালচার, যৌগিক কলেজ
1977
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi -, Govt,. of India

কোর্স ফি : ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা।
ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস : ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯
9051721420 / 9830597884/9836522503

নালন্দা থেকে মার্সেইলিস গ্রন্থাগারে জেহাদিদের অগ্নিসংযোগ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হয়, নইলে একদিন ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে হয়। ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগতেই দেশজুড়ে তাণ্ডব শুরু করেছে উদ্বাস্তু শরণার্থীরা। কাফের হত্যা, ধর্মস্থান ধ্বংস, ঐতিহ্য নষ্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধা, পুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, এখানে হামলা, ওখানে বিস্ফোরণ এটাই চলে আসছে— শুধু দখলদারি, সর্বত্র একটাই চিত্র।

গত ২৭ জুন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে ট্রাফিক আইন ভাঙায় আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ১৭ বছরের এক ফরাসি গাড়িচালককে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। আলজেরিয়া থেকে আসা সেই নাবালকের মা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেলের মৃত্যুর প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেন। আর তারপর থেকেই সেদেশের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে হিংসা। হিংসাত্মক ঘটনায় জখম হয়েছেন প্রায় ৩০০ পুলিশ অফিসার ও পুলিশ কর্মী। প্রায় ৫০০টি সরকারি ভবনে দাঙ্গাবাজরা হামলা চালায়। ধ্বংস হয়েছে কয়েক কোটি ডলারের সম্পত্তি। দাঙ্গার চতুর্থ দিনে প্রায় ১৭০০ জন দাঙ্গাবাজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৪৫ হাজার সেনা ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে নামাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। তার মধ্যে শুধু প্যারিস শহরেই নামানো হয়েছে ৫০০০ আধাসেনা। রাজধানীর রাস্তায় টহল দিচ্ছে হালকা সাঁজোয়া গাড়ি।

আলজেরিয়া থেকে আসা অভিবাসী পরিবারের ছেলের মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা অভিবাসীরা এই বিক্ষোভের প্রথম সারিতে। আরও জানা গিয়েছে আগুন লাগানো হয়েছে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিঙে। সেখান থেকে টাউন হল লাইব্রেরিতে। ছাই হয়ে গিয়েছে সব বই। পুড়ছে একের পর এক স্কুল, দোকান, বাড়ি, ব্যাংক, ট্রান্সপোর্ট, ট্রেন, বাস, ট্রাম, দেশের সম্পদ। প্রশাসন বলছে হিংসার জন্যে পুড়ে গিয়েছে হাজার হাজার বাড়ি, লুট হচ্ছে বন্দুকের দোকান। বিক্ষোভের নামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ মার্সেইলিস্ আলকাজার গ্রন্থাগারও। শোনা যাচ্ছে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে জ্ঞানের সব সম্পদ।

১২০২ সালের পর দীর্ঘ ৮২১ বছর পর ২০২৩ সালে পুনরায় গোটা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখল ফ্রান্সের সবচেয়ে বড়ো মার্সেইলিস পাবলিক লাইব্রেরি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে। ঠিক এইরকম অসভ্য বর্বরদের বই পোড়ানোর ইতিহাস ভারত দেখেছিল ১২০২ সালে। আর ২০২৩-এ এসে এবার দেখছে বিশ্ব। নালন্দা থেকে মার্সেইলিস বর্বরদের বই পোড়ানোর ইতিহাস চলছে। আপনারা জানেন ১১৮৫-এর পর থেকে প্রায় ১২০৫ সাল অবধি চূড়ান্ত অরাজকতার মধ্য দিয়ে চলেছিল ভারতবর্ষ। সে সময় এক অসভ্য বর্বর বখতিয়ার খিলজি ১২০২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে সেখানকার গ্রন্থাগারকে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিল। সেই গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় আর একটিও ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আসতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবং দু' হাজার শিক্ষক এখানে জ্ঞানচর্চা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি ছিল একটি ন'তলা ভবন যেখানে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হতো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। ধর্মের পাশাপাশি বেদ, উপনিষদ, বিতর্ক, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষবিদ্যা, শিল্পকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র-সহ তৎকালীন সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগী আরও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত পাঠদান চলত এখানে। এইরকম একটি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ও তার গ্রন্থালয়কে সহ্য করতে পারেনি বর্বর বখতিয়ার খিলজি।

বখতিয়ার খিলজি ভারতে এসেছিল লুণ্ঠন করতে। তার তো গ্রন্থাগারের ওপর ক্ষোভ থাকার কথা নয়। তবে কেন গ্রন্থাগারটিকে ভস্মীভূত করে দিল? কারণ এরা চায় না সভ্যতা এগিয়ে যাক। সভ্যতাকে এরা এক জায়গায় থমকে রাখতে চায়। তাই গ্রন্থের ওপর নামিয়ে এনেছিল চরম আঘাত। পুড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থাগার। যে গ্রন্থাগার পুড়ে শেষ হতে সময় লেগেছিল পুরো তিন মাস। সেই বখতিয়ারের উত্তরসূরিরা আজও অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সহ্য করতে পারছে না। যতদিন এরা পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন জ্বলবে পুড়বে সমগ্র পৃথিবীর মানব সভ্যতা।

তবে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় ভারতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে তা হলো— ফ্রান্সের হিংসা থামাতে চাই যোগী আদিত্যনাথের বুলডোজার মডেল। সেই প্রচারে সায় দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারও। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে লেখা রয়েছে— 'চরমপন্থা দাঙ্গায় মদত দেয়, তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। তখনই বিশ্ব যোগী মডেলের শরণাপন্ন হয়।' উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মহারাজজী যেটা করেছেন সেটার উপর এখন গুরুত্ব দিচ্ছেন সকলেই। শুধু যোগী মডেলেই নয়, সভ্য সমাজকে আবিষ্কার করতে হবে যোগী মডেলের চেয়ে আরও কঠিন কোনো মডেল পাওয়া যায় কিনা। আর সেই মডেল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে বিশ্বের যে কোনো স্থানে যখন আক্রান্ত হবে মানবসভ্যতা। কেননা সভ্যতাকে কখনই অসভ্যতা এবং বর্বরতার হাতে পরাস্ত হতে দেওয়া যায় না, যাবে না। □

কেরালা স্টোরির পর আসতে চলেছে ‘বস্তার’

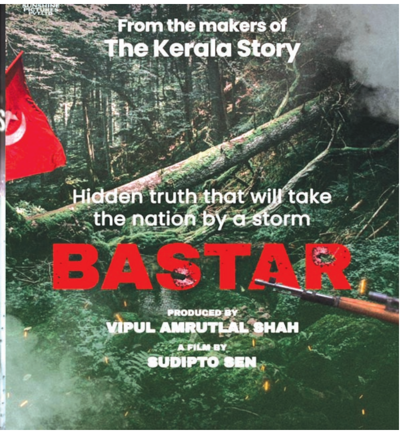

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বক্স অফিসে কেরালা স্টোরির বিপুল সাফল্যের পর প্রযোজক অমৃতলাল শাহ ও পরিচালক সুদীপ্ত সেনের তরফে আসতে চলেছে ‘বস্তার’, যে সিনেমাটি দেশের আরেক অংশের লুকিয়ে থাকা সত্য সামনে আনবে। ৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে এই সিনেমাটি মুক্তি পেতে চলেছে বলে খবর। মধ্য ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের বস্তার একটি নকশাল অধ্যুষিত জেলা। উপদ্রুত এই এলাকাকে কেন্দ্র করেই এই সিনেমাটি নির্মিত হতে চলেছে বলে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ।

লাস্ট মঙ্ক মিডিয়ার সহযোগিতায় সানশাইন পিক্চারস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমার পোস্টার সম্প্রতি টুইটারে প্রকাশ করেছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞ তরণ আদর্শ। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে অরণ্যের মাঝে পড়ে থাকা একটি গাছ, এক কোণে একটি লাল ঝান্ডা ও জঙ্গলের দিকে নলের মুখ করে থাকা একটি বন্দুক। প্রসঙ্গত, বামপন্থী ও তথাকথিত লিবেরাল ব্রিগেড কেরালা স্টোরির মতো ইতিমধ্যেই এই সিনেমাটিকেও অতিরঞ্জিত ও প্রোপাগান্ডা ফিল্ম হিসাবে অভিহিত করেছে।

এই সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার আগে ও পরে দেশের মধ্যে বামপন্থী ও লিবেরাল ব্রিগেডের আন্দোলন ও এই সিনেমার বিরুদ্ধে তাদের তরফে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা। কংগ্রেস সমেত অন্য বিরোধী দল শাসিত রাজ্য সরকারগুলির তরফেও বাধাদান করা হতে পারে।

আমেরিকান সংগীতশিল্পী মেরি মিলবেন গাইলেন ভারতের জাতীয় সংগীত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরকালীন ওয়াশিংটন ডিসিতে রোনাল্ড রেগন সেন্টারে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলনে আমেরিকান গায়িকা মেরি মিলবেন ভারতের জাতীয় সংগীত গাইলেন। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে মোদীজীকে তিনি নমস্কার সহকারে অভিবাদন জানান ও তাঁর পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম জানান। ইউনাইটেড স্টেটস্ ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ছিল প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরসূচিতে থাকা শেষ অনুষ্ঠান যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। মেরি মিলবেন জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর ‘ভারত মাতা কী জয়ের’ প্রবল হর্ষধ্বনি মুখরিত মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী এলে মেরি মিলবেনের সঙ্গে মোদীজীর সঙ্গে সৌজন্য বাক্যবিনিময়ও করতে দেখা যায়।

ওকলাহোমায় জন্ম হওয়া মেরি মিলবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী সকাশে প্রবাসী ভারতীয়দের এই সম্মেলনে ভারতের জাতীয় সংগীত গাইতে পেরে নিজেকে ধন্য ও সম্মানিত বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর সমস্ত হৃদয় ও চিন্তাজুড়ে স্থান করে নিয়েছে ভারতবর্ষ এবং সমগ্র মানবজাতিকে এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি সাধনে তিনি প্রার্থনা করছেন বলে জানান। ২১ জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘের দপ্তরে আয়োজিত নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে মেরি মিলবেন অংশগ্রহণ করেন এবং ‘ওম জয় জগদীশ’ নামক ভারতীয় ভক্তিগীতিটি পরিবেশন করেন।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসে খালিস্তানি তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১ জুলাই মধ্যরাতে (রাত দেড়টা থেকে আড়াইটের মধ্যে) আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসে বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানিরা অগ্নিসংযোগ করে। স্থানীয় দমকলের সহযোগিতায় অগ্নিনির্বাপণ করা হয়। সূত্র অনুযায়ী, এই ঘটনার পরে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত সবাই অক্ষত আছেন এবং কেউ আহত হননি। খালিস্তানি সমর্থকরা এই ঘটনার পরেই এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার ট্যুইট করে সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করেছেন এবং আমেরিকাতে বিদেশি দূতাবাস, রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিবিদ্‌দের ওপর আক্রমণ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে তিনি জানান। মার্চ মাসে এই সানফ্রান্সিসকোতেই ভারতীয় দূতাবাসের ওপর আক্রমণের ঘটনার কয়েক মাস পর শনিবারের এই হামলা। খালিস্তানপন্থীরা স্লোগান দিতে দিতে দূতাবাসের সামনের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে যায় ও দূতাবাসের সামনের জমিতে তাদের দুটি ঝান্ডা পুঁতে দেয়। লণ্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা চালিয়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা নামিয়ে দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই সানফ্রান্সিসকোতে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে ১৯ জুন কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে এক গ্যাংওয়ারে খালিস্তান টাইগার ফোর্সের প্রধান হরদীপ সিংহ নিজ্জরের মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে 'শিখস্ ফর জাস্টিস' নামে একটি খালিস্তানপন্থী সংগঠন একটি হুমকি পোস্টার প্রকাশ করেছে। যেখানে নিজ্জরের হত্যাকারী হিসেবে মিথ্যে দোষারোপ করে কানাডার ওটাওয়ার ভারতীয় হাইকমিশনার সঞ্জয় কুমার ভার্মা, টরন্টোতে ভারতীয় কনসাল জেনারেল শ্রীমতী অপূর্বা শ্রীবাস্তবকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশে টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণের লক্ষ্যে ৮ জুলাই খালিস্তান ফ্রিডম র‍্যালির ডাক দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং কানাডাকে অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জলি এই পোস্টারকে অবাঞ্ছিত বলে উল্লেখ করে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সুরক্ষার বিষয়ে ভিয়েনা কনভেনশনের প্রতি কানাডা দায়বদ্ধ বলে জানিয়েছেন। এই উগ্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানিদের কার্যকলাপের ব্যাপারে কানাডা, আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত সরকার আলোচনা চালাচ্ছে বলে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর জানান।

এইসব দেশের মাটিকে খালিস্তানি কার্যকলাপে ব্যবহৃত হতে না দেওয়ার বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের দাবিটিও তিনি জোরালো করেছেন। খালিস্তানিদের অস্তিত্ব এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৫১।।

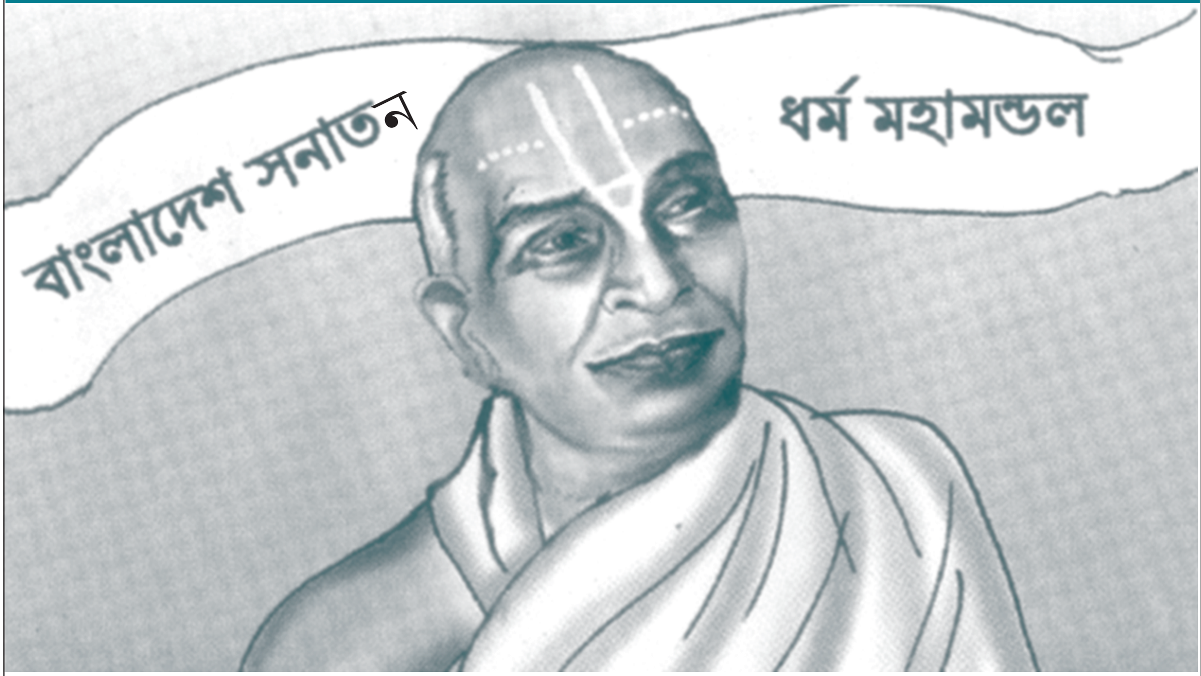

১৯৭৫ সালের ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে হলো হিন্দুদের মহাসম্মেলন। বাংলাদেশের হিন্দুরা দলে দলে যোগ দিলেন। গঠিত হলো 'বাংলাদেশ সনাতন ধর্ম মহামণ্ডল'।

এবার শুরু হলো মহানামব্রতজীর ভারত পরিক্রমা। অসম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র গেলেন তিনি। ১৯৭৭ সালে পুরীতে জগদ্বন্ধু আশ্রম আর ১৯৭৯ সালে কৃষ্ণনগরে মহেন্দ্রবন্ধু অঙ্গন প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। ১৯৯১ সালে সেখানে অপরূপ মন্দির করে প্রভুবন্ধুর অপ্রাকৃত দেহ রাখা হলো।

(ক্রমশ)